

মাধুর* জন্য

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



৫১১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৫৯

প্রকাশক : দিলীপ মিত্র : ৫১১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : গোতম রায়

মুদ্রাকর : বিশ্বনাথ কবিরাজ : গঙ্গা মুদ্রণ

৫৪১বি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট : কলিকাতা-৪

মাধুর জন্ম

মাধু যখন ছোটো ছিল, তিন কি চার বছর যখন তার বয়স, তখন কলকাতার প্রকৃতিহীন ফ্র্যাটে বাজবন্দী জীবনযাপন থেকে মাঝে মাঝে তাকে মুক্ত করতে আমি, অর্থাৎ তার বাবা তাকে রবিবার রবিবার প্রকৃতি দেখাতে নিয়ে গেছি ময়দান, সোনারপুর্, উলুবেড়ো বা গুরুকম সব জায়গায়। স্ত্রী নারাজ ছিল বলে আমাদের ওই একটির বেশী দূরীট হয়নি। মাধু আমাদের একমাত্র। আমাদের সব আদর ভালবাসার প্রচণ্ড ও একমুখী লক্ষ্যস্থল। সেই প্রবল আদরের ধাক্কা সামলে আজ সে—

আজকের কথা পরে। কথা হল, মাধুকে আমি আমার মতো মানুষ করতে চেয়েছি, আমার স্ত্রী চেয়েছে তার মতো করে। মাধু কাউকেই নিরাশ করেনি। মনে হয় এক মাধু দূরকমভাবে বেড়ে উঠেছে। এক মাধু দূরকম মানুষ হয়েছে। হতেই হয়েছে তাকে। না হয়ে উপায় ছিল না। আমি তাকে প্রকৃতি দেখাতে চেয়েছি, শিখিয়েছি ভিত্তিরিকে ভিক্ষে দিতে। ছবি আঁকা শেখাতে চেয়েছি, ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে সে ডাক্তার হোক, যা আমি হতে চেয়েও পারিনি। আমি একসময়ে কিছু ব্যায়াম করেছিলাম এবং হাওড়াশ্রী হয়েছি দূবার। ফলে মাধুকে ব্যায়াম শেখানোর প্রতিও আমার আগ্রহ ছিল। আমার স্ত্রী তাকে ইংলিশ মিডিয়ামে চোলাই করে, নৃত্যগীত পারদর্শিনী ও তেজস্বিনী করতে চেয়েছে। সেটাও কিছু খারাপ নয়।

মাধু এই বৈশাখে সতেরো পূর্ণ করল। পার হয়ে গেল আমাদের বিংশতিতম বিবাহ বার্ষিকী। আমি বিস্তর ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করে এবং আমার স্ত্রীর অক্লান্ত প্রয়াসে অবশেষে আমরা একটা ওনারশিপ ফ্র্যাট কিনতে পেরেছি লেক গার্ডেনসে। স্বামী ও স্ত্রী প্রতি মাসেই নিজ নিজ বেতন থেকে ফ্র্যাটের বকেয়া টাকা শোধ করে যাই। আমার ও আমার স্ত্রী চমকের মধ্যে বোঝাপড়া বা সমঝোতা চমককার। সেই কারণেই আমাদের দাম্পত্য জীবনের প্রেমহীনতা বাইরে থেকে একবারেই বোঝা যায় না।

প্রেমহীনতা কথাটা বেশ মোলায়েম। ঘৃণা, বিদ্বেষ ইত্যাদি শব্দের চেয়ে প্রেমহীনতা অনেক গভীর ও নরম শব্দ। বাস্তবিকই আমি ও আমার স্ত্রী পরস্পরকে ঘৃণা করি না, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষও নেই। সাত বছর প্রেম করার পর আমরা বিয়ে করি এবং বিয়ের দু বছরের মধ্যেই বদ্ব্যভিচারে পারি যে, বিয়ের আগে সাত সাতটা বছরের পণ্ডিত্রম আসলে একটা “সোনার হরিণ চাই” গোছেরই কিছু ছিল। ওই সাতটা বছর কেন যে আমরা পরস্পরকে চেয়ে গেছি লাগাতার

সেইটাই একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। তা বলে আমরা ঝগড়াঝাঁটি এবং অন্যান্য ফ্যাংকড়া তুলিনি। তবে পরস্পরের প্রতি নিস্পৃহতা আসতেও সময় লাগেনি।

সৌভাগ্যবশত আমার স্ত্রী দৃঢ়দান্তি বেসরকারী বাণিজ্যিক সংস্থায় চাকরি করে। আমার চাকরি পদলিখে। দৃঢ়জনের রোজগার যোগ করলে এ বাজারেও মোটামুটি ভদ্রভাবে বেঁচে থাকা যায়। এই অর্থনৈতিক কারণটাই আমাদের বিয়ের পর জুড়ে রাখল।

পদলিখের চাকরিতে উপরি রোজগারের প্রলোভন অটেল। তাই বলেই সব পদলিখই চোর একথা ভাবতে নেই। অতত আমি নই। তার কারণ এমন নয় যে, আমি সং এবং চরিত্রবান। আসলে ঘৃণ্য খাওয়ারটার আমি কোনো মানেই খুঁজে পাই না। আর কেমন যেন ফালতু টাকা হাত পেতে নিতে একটু ভীতি-ভীতির লাগে নিজেকে। লজ্জা হয়। এটা অবশ্য একটু অভ্যাস করলেই কেটে যেত। কিন্তু আমি প্রথম থেকেই অভ্যাস করিনি। তুলনামূলকভাবে আমার স্ত্রীর রোজগার অনেক ভাল।

বিয়ের পর তিন বছর বাদে আমরা খুব হিসেব-নিকেশ করেই মাধুকে পৃথিবীতে আনি। মাধু আমাদের বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয় আঠা। অর্থনীতি ও সন্তান এই দুই না থাকলে দাম্পত্য জীবনটা আমাদের আরো খাপছাড়া হয়ে যেত।

জন্মের কিছু পরেই মাধু আমাদের দৃঢ়জনকে পেয়ে বসল। মাধু ছাড়া আমরা আর কিছুই যেন চোখে দেখিনি।

সেই মাধু এখন সতেরোয়।

সুন্দরী কিনা? সেটা বলা মর্শকিল। তবে বোধহয় খারাপ নয়। বেশ লম্বাটে, স্বাস্থ্যবতী, বুদ্ধিমতী মেয়ে। গান, নাচ, কথা ইংরিজি, ছবি আঁকা ইত্যাদি সব বিষয়েই চলেবল। প্রিম্রোডিকলে আর্ডমিশন নিয়েছে এবং বোধহয় ডাক্তার হয়ে বেরিয়েও আসবে।

আমার একটু মদ্যপানের অভ্যাস আছে। একটু মেয়েমানুষের দোষও। তবে এ দুটোই আমার স্ত্রী চমকের অনুমোদনপ্রাপ্ত। চমকের সঙ্গে তার এক সহকর্মী দীপ্তসুন্দরের একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আমি সেটা অনুমোদন করেছি কারণ আমরা দৃঢ়জনেই এক বাস্তবের বসবাস করে বুঝেছিলাম পরস্পরকে পাওয়ার পর আর পরস্পরকে দেওয়ার মতো নতুন কিছু আমার বা চমকের নেই। দীপ্তসুন্দর সেই নতুন কিছু হয়তো বা দিতে পারে চমককে। তবে তারা ছেলেমানুষ নয়। সংসার ভাঙবে না, সন্তানেরও জন্ম দেবে না, এসব গ্যারান্টি আছে। সমঝোতা আছে। আমিও কোনোদিন মাতাল হয়ে ফিরব না বা খারাপ পাড়ায় পুরো রাত কাটাব না। দৃঢ়জনেরই এইসব ক্ষমার যোগ্য দোষ থাকায় পরস্পরকে মৃদু দেখাতে আমাদের তেমন লজ্জা হয় না। আমাদের লুকোনোরও বেশী কিছু নেই পরস্পরের কাছে। লুকিয়ে কী হবে? দীপ্তসুন্দর চমকের বস।

অফিসের বিভিন্ন টেকনিক্যাল কাজের ভিতর দিয়ে ওদেব মধ্যে চমৎকার একটা পেশাদারী আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। দীপ্তসুন্দর চমকের জন্য জান-কবুল করে অফিসে লড়ে যায়। লিমফট, স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি পেতে চমকের কোনো অসুবিধে হয় না। পরস্পরকে ওদের প্রয়োজন হয় অনেক বেশী। সে ব্যাপারে আমার নাক গলানোটা নিতান্তই সিঁদ কাটা! আমার চেয়ে বরং দীপ্তসুন্দরই চমককে বোঝে এবং জানে বেশী। তুলনায় আমি অবশ্য ততটা ভাগ্যবান নই। চমকের একজন খাঁটি প্রেমিক আছে। আমার নেই। আমার মেয়েমানুষেরা ভাড়াটে, হৃদয়হীন, শরীর সর্বস্ব। তাহোক। হৃদয়ের জন্য আমার আঁকুপাঁকু নেই। পদলিশের লোক বলে আমার কাছ থেকে তারা পরস্যা নিতে চায় না। তবু পাছে শরীর নেওয়াটাও ঘুষের পর্যায়ে পড়ে যায় সেইজন্য আমি দু পাঁচ টাকা তাদের দিই। তারা খুশি হয় এবং আমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় পৰ্যন্ত করে।

লোকে এসব শুনে হয়তো বলবে, নোংরামি। তা একরকমের বিচারে হয়তো তাই। বিচার বোধ এবং বিচারের মাপকাঠি নানা ধরনের। কারটা ঠিক, কারটা বৈধিক তা বলা শক্ত। কিন্তু আমরা অকপটভাবে আমাদের মতোই। কিন্তু এসব অভ্যাস আমরা বাড়ির বাইরেই রেখেছি। মাধু তার কুফল কখনো ভোগ করেনি। আমাদের বাক্সঘর মোটামুটি শান্ত, শূন্য নিষ্কলঙ্ক। মাধুর প্রতি আমাদের ভালবাসা খাদহীন। আমি ও চমক মাধুর জন্য একটি স্বর্ণ রচনা করার চেষ্টা করেছি। তার ভবিষ্যৎ কুসুমাস্তীর্ণ করে দেওয়ার জন্য আমরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। মাধুকে নিয়ে আমরা বছরে একবার বা দুবার কাছে বা দূরে বেড়াতে যাই। মাধুর জন্য প্রতি বছর বেশ কয়েকবার নানা উপলক্ষে দারুণ সব মড পোশাক ও গয়না কেনা হয়। মাধুর প্রিয় মাছ ও মুরগি, মাধুর প্রিয় রাবড়ি বা আইসক্রিম রোজই বাড়িতে আসে। মাধুর অপ্রিয় রং, মাধুর অপ্রিয় কোনো সেন্ট এ বাড়িতে ঢোকে না। মাধুকে খুশি রাখার জন্য আমি ও চমক চমৎকার, বগড়াহীন একটা দাম্পত্য আবহাওয়া বজায় রেখে চলি।

ঘটনাটা ঘটল এইভাবে। থানায় একটা মারডার কেস জমা পড়লে আমাকে প্রাথমিক তদন্তের ভার দেওয়া হয়। স্পটে গিয়ে দেখি, একজন কুড়ি বাইশ বছরের ছোকরা উপড় হয়ে নালার ধারে পড়ে আছে। পরনে ফুলপ্যাণ্ট আর একটা ব্যানলনের গেঞ্জি। বেশ ভাল চেহারা। বুক আর মাথার দু দুটো ৩৮ বোরের রিভলবারের ফুটো। ফটোগ্রাফাররা কাজ সেরে চলে যাওয়ার পরে ডেড-বর্ড সরাণোর আগে আমি ছোকরাটাকে সার্চ করতে গিয়ে তার বুক পকেটে মাধুকে লেখা আমার ফ্ল্যাটের ঠিকানা সমেত একটা চিঠি পেয়ে যাই। নিয়ম-মতো চিঠিটা অন্যান্য প্রাপ্ত জিনিসের সঙ্গে থানায় জমা দেওয়ার কথা। বলা বাহুল্য আমি তা করিনি।

খুনের কেস-এ প্রাথমিক তদন্ত যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ক্রান্তিকর। আই-

ডেনটিফিকেশন হয়ে যাওয়ার পর মৃতের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছে হাঁটাহাঁটি, খোঁজখবর ইত্যাদি খুবই একঘেয়ে এবং রুটিনমারফিক ব্যাপার। রহস্য বা রোমাঞ্চ তেমন কিছু থাকেও না। এইসব করতে দিন তিনেক যথেষ্ট হিমশিম খেতে হল। জানা গেল, ছোকরা বেহালার সুকল্যাণ দত্ত, মোড়িকেল ছাত্র, ফোর্থ ইয়ার।

এই তিন দিন আমি মাথাকেও এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করিনি, করা উচিতও হত না। তবে খবরের কাগজে খুনের খবর ছিল। আমি জানি, মাথু ওটা পড়েছে। যদি নাও পড়ে থাকে তবে কলেজে অন্তত আলোচনা শুনছে। না শুনেন বা না জেনে তার উপায় নেই। কিন্তু তার মৃত্যু বা চোখে সেরকম কোনো বিভ্রান্তি, শোক বা বিস্ময়ের ছাপ দেখা গেল না।

মজা হল, আমিও চিঠিটা খুলে পড়িনি। সুকল্যাণ দত্তের চিঠিটা আমি আমার নিজের টেবিলের লকারে ঢাবি বন্ধ করে রেখে দিয়েছি।

আমাদের দেশের অধিকাংশ খুনই কাঁচা হাতের কাজ। তা বলে খুনী যে সবসময়েই ধরা পড়বে তার কোনো মানে নেই। এক কথা, সাক্ষীসাবুদ পাওয়া শক্ত, দ্বিতীয় কথা, রাজনৈতিক খুন হলে কিছু করার থাকে না। তিন নম্বর কথা হল, খুনীদের মোটিভ সবসময় বোঝা মর্শকিল। এ ছাড়াও হাজারো অসুবিধে আছে। সব বলা সম্ভব নয়। তবে সুকল্যাণ দত্তের ব্যাপারে আমি পুর্লিশ বলে নয়, একজন শক্তিত হৃদয় বাবা হিসেবেও একটু বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। মাথু মারই ডাক্তারি পড়তে শুরুর করেছে, সুতরাং ফোর্থ ইয়ারের কোনো ছাত্রের সঙ্গে ওর তেমন গাঢ় প্রেম হওয়ার কথাই নয়। ওর নিরুদ্বেগ ভাবও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তবে সুকল্যাণের পকেটে পাওয়া চিঠিটা আমাকে অস্বস্তি দিচ্ছিল।

চমক মেয়েমানুষ হলেও খুব আধুনিক মেয়েমানুষ। শক্ত ধাঁচের। তাকে কথাটা বলা যায়। একা আমি সমস্যাটা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলাম। সুকল্যাণ দত্তের শোকগ্রস্ত বাবা মা ভাইবোন ও বন্ধুদের আমি জেরায় জেরায় জিজ্ঞাসিত করে দিয়েছি। খুনের রুও পাওয়া গেছে। কিন্তু মোটিভ বোঝা যাচ্ছে না, খুন করেছে কয়েকজন পেশাদার গুন্ডা। আমি তাদের ভালই চিনি। তারাও আমাকে চেনে। গা ঢাকা দিয়ে আছে। তবে একজনকে আমি কলাবাগানের বস্তু থেকে ধরে আনলাম। সে কবুল করলো, কালো একজনের কাছে টাকা খেয়ে খুনটা আরেনও করেছে, কিন্তু পারটিকে সে চেনে না। কালো হরিদ্বার পালিয়েছে।

সুতরাং অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু অপেক্ষা করাটা যে দারুণ শক্ত ব্যাপার তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম। উত্তরপ্রদেশের পুর্লিশকে ব্যাপারটা জানানো হয়েছে। তারা এখনো কালোর হাঁদিশ দিতে পারেনি। আর কালো যে হরিদ্বারেই আছে এমন নয়। ওদের আমি খুব ভাল চিনি। মারডার করলে এবং গ্রেফতার এড়াতে হাজারো সাবধানতা নেয়।

কেস আদালতে উঠলে সুকল্যাণের প্রসঙ্গে মাধুর নামও এসে পড়ে কিনা তাই নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা। যে পার্টি সুকল্যাণকে খুন করিয়েছে সে আবার মাধুর প্রেমিক নয়তো ! এ কি প্রেমের ত্রিভুজ ?

একদিন মাঝরাতে শোয়ার ঘরের কবাট শক্ত করে এঁটে কথটা চমককে বললাম।

কঠোর মুখ করে সবটা শুনলে চমক বলল, চিঠিটা দেখি।

চিঠি রেডি ছিল। বের করে দিলাম।

চমক অবাক হয়ে বলল, এখনো খোলোনি ?

সাহস পাচ্ছিলাম না। তুমি খোলো।

চমক খুলল এবং পড়তে লাগল। বেশ বড় চিঠি। একটা ফুলস্কাপ কাগজের দু পৃষ্ঠা। অনেক সময় নিয়ে চমক পড়ল।

কী লিখেছে ?

তুমি পড়ে দেখ। বলে চিঠিটা ফের আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে চমক ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে মুখে ক্রিনজিং ক্রিম মাখতে লাগল।

চিঠিটা খুলে আমি একটু থমকে যাই। আগাগোড়া ইংরিজি এবং অত্যন্ত জড়ানো অক্ষরে লেখা। ডাক্তারের হাতের লেখা সাধারণতঃ খারাপ হয় জানি কিন্তু হবু ডাক্তারের লেখাও যে এত বিদঘুটে হতে পারে তা জানা ছিল না।

আমি কিছুক্ষণ চেষ্টা করে “সুইট মাধবী ডারলিং...” পড়তে পারলাম। একটু হতভম্ব হয়ে চমকের দিকে চেয়ে বললাম, আমি তো পড়তেই পারছি না। তুমি কিছু বদ্বলে ?

চমক মুখটা আমার দিকে ফিরিয়ে বলল, রোজ আমাকে হরেকরকম হাতের লেখা দেখতে হয়।

তার মানে তুমি বদ্বলে পেরেছো ?

হ্যাঁ। তোমার বদ্বলে কাজ নেই।

তার মানে ?

ওতে বা লেখা আছে তা জানলে তোমার রাতে ঘুম হবে না।

আমি একটু রেগে গিয়ে বলি, ওসব কী বলছ ? আমি পুঁলিশ, রহস্যটা আমাকে সমাধান করতেই হবে। চিঠিতে কোনো রুদ্ থাকলে সেটা আমার জানা দরকার।

চমক মৃদু স্বরে বলল, চেষ্টাও না ; তবে প্রথমেই বলি, চিঠিটার সঙ্গে খুনের এমনিতে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু চিঠিটা সরিয়ে ফেলে তুমি বদ্বিধমানের কাজ করেছো। ভয়ংকর অশ্লীল চিঠি।

কতটা ?

যতটা হতে পারে।

ওরা কি সেকসুয়ালি... ?

বহুবার। চিঠিতে তার একটা বিবরণ আছে।

আর কিছ্‌দু ?

হ্যাঁ। তোমার মেয়ের এটা প্রথম ঘটনা নয়।

বলো কী ? এসব মাধু শিখল কোথেকে ?

কি করে বলব ?

আরও ছেলের সঙ্গে ?

দুঃজনর তো নাম পাচ্ছি। দেবাশিস আর সমুদ্র।

দুঃজনকে আরেস্ট করা যায় ?

নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু মাধুরীর নাম গোপন রেখে নিশ্চয়ই নয়।

চিঠিটার দিকে আমি খুব কুঁচকে চেয়ে থাকি। একটা আশঙ্কা আমার ছিল যে, চিঠিটা খুব নিরাপদ নয়। কিন্তু এটা যে এরকম পরবোমা তাও আমি আশা করিনি। আমার শরীরের ভিতরটা এমন অস্থির হতে লাগল যে ভয় হল আমার একদুনি একটা স্ট্রোক হবে।

চমক ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রিম মাথতে মাথতে খুব নির্বিকার গলায় বলল, মেনে নাও।

কী মেনে নেবো ?

ব্যাপারটা।

কোন ব্যাপারটা ?

তোমার মেয়ের ব্যাপারটা। তুমি খুব শক্‌ড্‌ হয়েছো বদ্বাতে পারছি।

আমার মাথাটা কেমন করছে। টলমল টলমল। চমক কী বলছে আমি তা সঠিক বদ্বাতে পারছি না। শূদ্র ওর প্রতিধ্বনি করে যাচ্ছি। আমার কোনো প্রশ্ন নেই। একটা ধাঁধা আছে। আমি আবার ওর প্রতিধ্বনি করে বলি, শক্‌ড্‌ ?

চমক আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়াল। পাতলা নাইলনের আঁত স্ফুট নাইটি পরা সুগন্ধী, সুদৃশ্য অভিজাত ও যৌন আবেদনে সমৃদ্ধা মহিলা। খুবই কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। তারপর আমার মাথাটা নরম বদ্বকের মাঝখানটার চেপে ধরে বলল, ওরকম করছ কেন ? একটু স্থির হও।

আমি কি অস্থির ?

তোমাকে ভীষণ আর্জিটেটেড দেখাচ্ছে। চীৎসার পার হয়েছো। এখন খুব মাথা ঠাণ্ডা রাখবে। অত ঘাবড়ে যাওয়ার কী আছে ?

কী বলছো বদ্বাতে পারছি না।

চলো শোবে চলো। একটা ট্র্যাংকুইলাইজার খেয়ে নাও।

আমি মাথা নাড়লাম না। মাথার ভিতরটা গোলমাল লাগছে ; আমাকে একটু ভাবতে দাও।

আমিও তো ওর মা। দেখ, আমি খুব ঘাবড়ে গেছি ?

না। তবে আমার সব ওলটপালট হয়ে গেছে !

কীরকম ওলটপালট ?

আমি যে মাধুকে ভীষণ ভালোবাসি। ভীষণ।

ও মা ! বাসবে না কেন ? তুমি তো ওর বাবা।

কথাটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ধনাবাদ চমক। আমি যে ওর বাবা সেটা আজ ভাল করে ভাবতে দাও। আমি একটু ছাদে যাবো।

ছাদে ! সর্বনাশ ! কক্ষনো নয় ! এসো আমার সঙ্গে শোও। আমি তোমার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছি।

চমকের দিকে চেয়ে আমার কেমন একটা ঘেন্নায় গা গুলিয়ে উঠল ; ওই শরীর দেখানো নাইটি এবং তার স্বচ্ছতার ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠা কামা শরীর আমার অস্পৃশ্য মনে হচ্ছিল। আমি একটা 'ওয়াক' তুলতে গিয়ে সামলে নিই। মাথা নেড়ে বিলি, না, ছাদে যাবো। খোলা হাওয়ায়।

চমক অবশ্য যেতে দিল না। তার হরতো ভয় হল, মানসিক ভারসাম্যের অভাবে এই পরিস্থিতিতে আমি আটতলার ছাদ থেকে নিচে লাফিয়েও পড়তে পারি। তার বদলে নিরাপদ ছিল গিল দেওয়া দক্ষিণমুখো বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসা অনেক ভাল বলে সে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করল।

আমি তাই বসলাম। ভিতরের ঘরে মাধু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। চমক হাই তুলে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে স্থায়ী কত'বা হিসেবে আমার পাশে আর একটা বেতের চেয়ার টেনে বসে রইল। তার এই নৈকটা আমার কাছে খুব অভিপ্রেত নয়, কিন্তু আমি কিছূ বললাম না।

চমক ছেলেভুলোনের কায়দায় বলল, এ ঘুগটা তো অন্যরকম। ঠিক আমাদের মতো নয়। এসব মেনে নিতে হবে।

আমার মাথা ঠাণ্ডা হয়নি। আমি চমকের তত্ত্ব বুঝতেও পারছি না। শূধু বললাম, তাই নাকি ?

একটু চুপ করে থেকে চমক আচমকা বলল, আমরাও তো ভাল নই।

কথাটা স্বীকারোক্তি হিসেবে খুবই চমৎকার হত যদি তার সঙ্গে গভীর অনুশোচনা মিশে থাকত। কিন্তু তা তো নয়। চমকের এই বিবৃতি নিতান্তই একটি স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাকট। অর্থাৎ আমরা খারাপ তাই আমাদের মেয়ে ওরকম হয়েছে। আমরা খারাপই থেকে যাবো। সুতরাং মেয়ের ব্যাপারটাও মেনে নাও।

আমি খারাপ না ভাল তার বিচার করার মতো যুক্তিবোধ আমার ভিতরে কাজ করছিল না। মাধু ফুলের মতো পবিত্র মাধু—যে হাঁ করলে এখনো তার মুখ থেকে আমি শৈশবের গন্ধ পাই—সে...

ঠিঠিটার কথা তোমাকে বলে বোধহয় ভুল করলাম। হাতের লেখা পড়তে পারছিলে না সেটাই ভাল ছিল।

তাতে আমার কাছে ব্যাপারটা অজানা থাকত মাত্র। কিন্তু সত্য তো আর

পালটাত না ।

চমক একটু ঝুঁকে আমার দিকে নির্বিড়ভাবে চেয়ে বলল, তার মানে কি তুমি এখন সত্যটাকে উল্টে দিতে চাও ?

চাইলে ? আমি প্রশ্ন তুলি ।

সর্বনাশ ! ও কাজ করতে যেও না । যদি শাসন করতে যাও মেয়ে একদম বিগড়ে যাবে ।

বিগড়ে যাবে ?

এখন তবু তোমার সঙ্গে এক ছাদের তলায় বাস করছে । কিছু বললে সটান বেরিয়ে গিয়ে কোনো ছেলেবন্ধুর রুমমেট হয়ে থাকবে । দরকার কী ? আমরা না-জানার ভান করলেই হয় ।

তুমি ওটা সমর্থন করছ ?

ঠিক করছি না । আমার মতে একজন বা দু'জন লাভার থাকা খারাপ কিছু নয় । ও একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে ।

একটু নয় সাম্প্রতিক ।

ঠিক আছে । তুমি কিছু বলতে যেও না । আমি বুঝিয়ে বলবখন ।

বুঝিয়ে বলবে ! বুঝিয়ে বলবে ! আমি বিড়বিড় করতে থাকি ।

লক্ষ্মীটি, নিজে কিছু করতে যেও না । তুমি মাধুকে একটুও বোঝো না ।

যদি বুঝতে—

আমি হঠাৎ চোঁচিয়ে উঠি, কিন্তু আমি বুঝতে চাই—

চমকের সুগন্ধি নরম হাত আমার মুখ চেপে ধরল ।

কী জানি কেন চমকের দেহ আজ গরম, রক্ত টগবগ করছে ; হাত সরিয়ে সে তার ঈষৎ ভেজা ঠোঁট চেপে ধরল আমার ঠোঁটে । আমার মনে হল একটা বিকট জোঁক আমাকে শুষে নিচ্ছে ।

আমি উঠে পড়লাম । আবার বসলাম । বললাম, তুমি শব্দে যাও ।

চমক আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আজ তুমি আমাকে নাও ।

না ।

না. কেন ?

আমি রাগের স্বরে বললাম, তোমার এই পরিস্থিতিতে সেক্ষ জাগছে কী করে ? আশ্চর্য !

জাগে । তুমি বুঝবে না । চলো ।

না . তুমি যাও ।

চমক একটা তীব্র শ্বাস ফেলল । তারপর উঠে গেল ।

আমি একা । চুপচাপ নিজের মাথাটা চেপে ধরে বসে আছি । আমি কী করব ? চণ্ডা চামড়ার বেট দিয়ে আমি মাধুকে আগাপাশতলা পেটাতে পারি ! গলা টিপে মেরে ফেলতে পারি । সব পারি, কিন্তু সে যেন নিজেকেই নিজের

নিষ্পেষণ। আমার মাধু—আমার ফুলের মত মাধু—তার ভিতরে এই কীট
এল কোথা থেকে? এল কেন?

অনেকক্ষণ বাদে যখন নিশ্চিত বদ্বলাম চমক ঘুমিয়েছে তখন আমি
নিঃশব্দে মাধুর ঘরে গিয়ে ঢুকি।

ঘরে একটা নীল আলো জ্বলে রোজ। আজ সেটা নেভানো। আমি ঘরে
ঢুকে দরজাটা ভেঙিয়ে দিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। অন্ধকার?
না, খুব একটা অন্ধকার নয়; বাইরের আলো আসছে আবছা।

ডাকতে হল না। মাধু খুব নীচু স্বরে বললো, বাবা!

আমি শব্দ করলাম না।

মাধু বাতাসের মতো মৃদু শব্দে বলল, আমি কাঁদছি বাবা।

কেন কাঁদছো?

তোমার জন্য।

আমার জন্য?

শুধু তোমার জন্য। তুমি যে কত দূরে! কত দূরে। মনে হয় যেন
বৈতরণীর ওপাশে।

তার মানে কী মাধু?

আমার মনে হয় তুমি বা মা—তোমরা যদি মরে যাও তাহলে আমার কান্না
পাবে না। ভাবলে ভারী অস্বস্তি হয়।

আমি শিউরে উঠি।

আমার ভিতরটা বড় ঠান্ডা। ভীষণ কোণ্ড রাডেড। সুকল্যাণের জন্য
আমার একটুও কণ্ট হয়নি। কারো জন্যই হয় না।

মাধু, তুমি জেনারেশন গ্যাপের কথা বলছ?

না, না আমি বলতে চাই, নতুন এক প্রজন্মের কথা। তুমি বদ্ববে না!

বদ্বব না?

না, কিছুতেই না। আমরা মঙ্গলগ্রহ থেকে আসা মানুষের মতো।
রোবটের মতো।

তুমি কে মাধু?

আমি কারো মেয়ে নই, কারো বউ নই, আমি কারো মা হবো না। আমি
মাধু, শুধু মাধু। তুমি যাও। আমি সহজে কাঁদি না, কত কণ্টে আজ চোখে
একটু জল এনেছি; মৃদুটা নষ্ট করে দিও না। যাও।

আমি ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসি। আশ্তে আশ্তে সিঁড়ি দিয়ে বা লিফটে
করে নামব না।

ট্রিলজি

১. তোমার চোখ

*'I am Lazarus,
come from the dead.
Come to tell you all.
I shall tell you all.'*

তোমার চোখের মধ্যে কবে ডুববে মরলাম, ঠিক বলতে পারি না।

কিন্তু মরার পর রোজ আমি নাড়ি দেখি : চলছে না। শ্বাস দেখি। বন্ধ।
বুকে হাত রাখি। শ্বক্শকুনি নেই। রোজ এই কাণ্ড।

চোখের রহস্য কোনদিন ভেদ হওয়ার নয়।

তোমার নামটি কী ছিল বলো তো ! জানি না। জিজ্ঞেস করা হয়নি।
আলাপও তো হল না এ জীবনে। একবার দেখা হয়েছিল মাত্র। আর নয়।

তবু আমি তোমার একটা নাম দিয়ে রেখেছি সেই কবে থেকে। মনোরমা।
সেই সময়ে, যখন তোমার সঙ্গে দেখা, আমার হাতে ছিল বস্কিমের মৃণালিনী।
পড়েছো ? পড়ে দেখো, মনোরমা ঠিক মতের মানবী নয়, দেবীও নয়। ওই
একরকম। যাকে চেনা যায়, আবার যায়ও না।

তখন আমার কৈশোরকাল, তুমিও কিপোরী। আমিনগাঁও ফেরীঘাট থেকে
স্ট্রিমার ছেড়ে গেছে, আমরা কিছুর বিলম্বিত যাত্রী একটা নৌকায় ব্রহ্মপুত্রের
বিস্কন্ধ স্রোত পাড়ি দিচ্ছিলাম, মনে পড়ে ? পড়বে না জানি। কত বছর কেটে
গেছে। আরও কতবার কত খেয়া শেয়িয়েছো তুমি। আমিও। সব পারাপার
মনে কি থাকে ? শুধু সেই নৌকায় তুমি ছিলে বলে আমার আজও চোখ
বুজলেই সেই স্রোত মনে পড়ে। আমিনগাঁও আর পাণ্ডুর—দুই দিকেই
পাহাড় ও পাথুরে তীরভূমি, গোহাটির কাছে মোড় ফিরে ব্রহ্মপুত্র সেই
সংকীর্ণ খাতে আর একটা মোড় দিয়েছে শরীরে। তাই বাঁকা স্রোত
সেইখানে আবর্ত ও ফেনায় ভয়ংকর।

আকাশ ছিল মাথার ওপর। বর্ষা শেষ মেঘমুগ্ধ ধোয়াকাচা নীলবর্ণ। ছিল
সুস্পষ্ট কালচে সবুজ রঙের পাহাড়ের শ্রেণী। দু'দিকেই। যাত্রীর ভারে মন্থর
নৌকো একটু উজানে গিয়ে কোনাকুনি গা ছেড়ে দেবে শুধুমাত্র হালের জোরে
ভাঁটিয়ে গিয়ে ঠেকবে পাণ্ডুর ঘাটে। এই ছিল নিয়ম। বারিদকে আমিনগাঁওয়ের

সেই টিলাটা দেখেছিলে তুমি ? তার ওপর দুটো মস্ত মস্ত খোড়ো বাংলা-বাড়ি । মনে নেই ? ওর একটাতে থাকতাম আমরা ।

তোমাকে দেখলাম ঊর্ধ্বমুখ । ভারী অবাক চার্ডিন চোখে, মুখখানা অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে । টুলটুল করছে মুখখানা । তুমি সুন্দর ছিলে কিনা তা ওই বয়সেই অনাভিজ্ঞ চোখে তো বদ্বাক্তে পারিনি । আজও সেই ধন্দ রয়ে গেছে । সুন্দর ছিলে কি ? আমি তোমার সবটুকু তো দেখিওনি ভাল করে । দুখানা অবাক চোখ ।

ওই উঁচু টিলার ওপরকার আকাশ দেখতে দেখতে চোখ দুখানা নামল ধীরে ধীরে । তখনো আবিলতা আসেনি আমাদের কারো চোখেই । নৌকোর দুই ধারে বসেছিলাম আমরা দুজন । কানার ওপর । বাঁশের ঠেকনো ছিল পিছনে । দুজনের মাঝখানে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি মানুষও ছিল অনেক । তাদের আমি লক্ষ্যই করিনি । তোমার দুখানা চোখ নেমে এসে খজনার মতো চারদিকে নেচে নেচে সব কিছুর দেখাছিল ।

চঞ্চল সেই খজনা স্থির হল আমার চোখের ওপর এসে ।

অনন্ত মূহূর্ত্ত কাকে বলে সেইদিন, সেইক্ষণে জেনেছিলাম । বৃক বাথিয়ে উঠল কয়েক শতাব্দীর পুঞ্জীভূত বিরহ-বেদনার শেষে । এক গৃহহান্যবীরের জন্মে শূন্য হয়েছিল যে অন্ত্রবিশিষ্ট তা হাজার হাজার বছরের জন্ম ও মৃত্যু, সভ্যতার অনেক উত্থান ও পতন, অনেক শ্রম ও অধ্যবসায়ের পর শেষ হল বৃক ! কিশোর বয়সের বোধ তো তেমন গভীর নয় । মনে কেবল অস্পষ্ট সব শব্দের আনাগোনা, তবু আমি ঠিকই শুনতে পেলাম এক দুরাগত দামামার ধ্বনি । কোথায় যেন যুদ্ধ চলছে । পতন হচ্ছে রাজ্যের । এক বিজয়ী ঘোড়সওয়ার শত্রুর রক্তে রাঙা বল্লম উঁচিয়ে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলেছে দিগ্বিজয়ে ।

মনোরমা, তুমি চোখ ফেরাওনি । আজ আবশ্য এক চোখে সেই ধূসর অতীতের দিকে চেয়ে আছি । তুমি চোখ ফেরাওনি বলে ধন্যবাদ । অজস্র ধন্যবাদ তোমাকে । এক কাঙাল কিশোরকে অপমান করোনি, আহত করোনি তার অভিমান । তোমাকে ধন্যবাদ ।

মানুষ কিছুর্তেই দেখতে পায় না নিজের মুখ । আমি সারাজীবন ধরে চেষ্টা করেছি সেই কয়েক মূহূর্ত্তে আমার মুখশ্রীর অপার্থিবতা লক্ষ্য করতে । বয়ঃসন্ধির সেটা বড় দুঃসময় জীবনে । হঠাৎ লম্বা হয়ে ওঠা শরীরে তেমন মাংস লাগেনি, হনু হাড় আর কণ্ঠা দেখা যায় । বড়রা সন্দেহের চোখে তাকায়, ছোটরাও দলে নিতে চায় না । নিজেকে কেমন যেন খেঁচা হয় । সেই সময়টাতেই মানুষের সবচেয়ে বেশি আদর ভালবাসার প্রয়োজন । কিন্তু হয় বয়ঃসন্ধিই তার সবচেয়ে খরার সময় ।

কিন্তু ওই কয়েক মূহূর্ত্তে আমার খরার আকাশ তুমি ভরে দিয়েছিলে বাদলমেঘে । কী বৃষ্টি ! কী বৃষ্টি ! আমার কোষে কোষে সঞ্চারিত হয়ে গেল

প্রাণবান জল। মনে হল, আমার মদ্য এক অলৌকিক দীপ্ত বিকীরণ করছে।

সেই আমার মরে যাওয়ার আগে শেষ জ্বলে ওঠা।

পাণ্ডুর ঘাটে নৌকো কখন ভিড়ল তা জানি না। কখন এক ভীড় লোক যে যার গন্তব্যে চলে গেল টেরও পাইনি। শূন্য ঢালু জমি বেয়ে চলে যেতে দেখেছিলাম তোমাকে। একদম সমভূমির সীমানায় উঠে তুমি আর একবার ফিরে দেখেছিলেন আমাকে।

কী দেখেছিলেন জানি। ব্রহ্মপুত্রের রূপোলি জলে শূন্য এক নৌকোর খোলে পড়ে আছে প্রাণহীন কিশোরের দেহ।

অন্ধকার ঘরে আমার স্ত্রী হারিকেন জেদে দিয়ে গেল। চারদিকে মশার ডাক। আমি এখন রুটি আর তরকারি খাবো একটু। তারপর আমার ছেলে-মেয়েদের পড়তে বসাবো। সকাল হবে। রাত হবে। কাজে যাওয়া। কাজ থেকে ফেরা। এইমতো দিন যায়। একদিন সময়ের চাকা তার খাঁজকাটা দাঁতে তুলে নিয়ে যাবে আমাকে।

ভেবো না, দৃশ্য করছি। তা তো নয়। আমি তো এই মানুষটা নই। সেই যে তোমার চোখ ক্ষণকালের জন্য আমাকে বাঁচিয়ে তুলে মেরে ফেলে গেল, সেই থেকে বন্য এক প্রাগৈতিহাসিক গৃহহামানব বোরিয়ে পড়েছে তার মেয়ে-মানুষকে খুঁজতে। জন্ম জন্ম পার হবে সে, নগর ধ্বংস করবে, তখনই করে দেবে ইতিহাস।

এখানে হারিকেনের আলোর যে রুটি-তরকারি খায় রোজ সন্ধ্যাবেলা সে মরে গেছে কবে।

২. ভূতের গল্প

মল্লিকা সেন! মল্লিকা সেন!

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর মজা খালের পাশে অভ্যস্ত ঘন কাঁটাঝোপের ভিতরে অবস্থিত শ্যাওড়া গাছটি সামান্য দুলে উঠল। একটা বিদঘুটে হাওয়া দিল উত্তর দিক থেকে। সন্ধ্যার আবহাওয়া আরো গাঢ় হল। কুয়াশা জমাট বাঁধতে লাগল চারপাশে। আমি একা!

হাওয়ার শব্দের ভিতর থেকে একটা ফিসফিস শুনতে পাই, আপনি আমাকে ডাকাছিলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমার গল্প কি সবাই শুনতে চাইছে?

চাইছে।

আমাকে খুন করেছিল আমার স্বামী। এ খবর তো সব কাগজে বোরিয়েছে।

আপনি নতুন কী জানতে চাইছেন ?

আজকাল স্বামীরা প্রায়ই স্ত্রীদের খুন করে থাকেন মল্লিকা সেন। গল্পটা বড়-পদুরোনো হয়ে গেছে। আমি একটু নতুন অ্যাসেল চাইছি।

এ গল্পের নতুন অ্যাসেল কিছু নেই। পুরুষশাসিত সমাজে এরকমই বারবার ঘটবে। আপনাদের কাগজে আমার খবরটার হেডিং কি ছিল বলুন তো ! মল্লিকা ঝরে গেল।

বাঃ। বেশ হেডিং। এরকম কত জুঁই, মল্লিকা, বেলি ঝরে যাবে তার কি হিসেব আছে !

অজুর্ন সেন লোকটা সম্পর্কে আমবা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তেমন খারাপ লোক নয়। কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। আজ এ ইয়ংম্যান লোকটা ছিল দারুণ রাইট, অত্যন্ত বন্ধুবৎসল এবং আড্ডাবাজ। লোকের উপকার-টুপকারও করত ! এসব কি সত্যি ?

বাজে কথা। ও ছিল হৃদয়হীন নিষ্ঠুর, কতবা-উদাসীন।

পাড়া-প্রতিবেশীরা অনেকেই বলেছে, আপনাদের সংসারে শান্তি ছিল না ঠিকই, কিন্তু সেইজন্য দায়ী অজুর্ন সেন নন।

আপনারা কি পাড়া-প্রতিবেশীদের বিশ্বাস করছেন ?

কাকে বিশ্বাস করব তা বন্ধুতে পারছি না।

আমি যখন ভিকটিম তখন আমার চেয়ে সত্যি কথা আপনাকে কে বলবে ?

তা অবশ্য ঠিক। তবে সেনবাবু যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে সে বলেছে, আমি বিয়ের পর থেকেই সব স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলতে থাকি। প্রথমে আমার স্ত্রী বন্ধুদের কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করেন, আড্ডা বন্ধ করে দেন, বাইরে বেরোনোর ওপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আমাকে আমার ষোঁথ পরিবার থেকেও নানা প্ররোচনা দিয়ে উনি বের করে আনেন ! ষোঁধপুত্র পাকের পৈতৃক বাড়ি থেকে আমি চলে যাই টালিগঞ্জের ভাড়াটে বাসায়। আমার একটি মেয়ে হয়। আমি তাকে আকণ্ঠ ভালবেসে ফেলি ! আমার সেই দুর্বলতা লক্ষ্য করে আমার স্ত্রী তার সব দায়-দায়িত্ব আমার ঘাড়ে গছাতে শুরু করেন অত্যন্ত সুকৌশলে। এমনকি রাত্রিবেলা আমার বাচ্চা বিছানায় পেছাপ করলেও কাঁথা বদলানোর জন্য উনি উঠতেন না। মেয়ে কাঁদত। সুতরাং আমাকেই সে কাজের ভার নিতে হয়। ক্রমে আমি মেয়েকে কিন্নরু বাটিতে দূধ খাওয়ানো পর্যন্ত শিখে যাই।

বাপেরা কি কিছুই করবে না ছেলেমেয়ের জন্য ? শূদ্র মেয়েরাই করবে ? বাচ্চা কি তার একার ?

তা অবশ্য নয়।

শুনুন, আমি সদ্য খুন হয়েছি। আমাকে খুন করেছে ওই বদমাশ, লম্পট, হৃদয়হীন লোকটা। বাংলার নারীসমাজ ওর ওপর ভীষণ ক্ষেপে আছে। আমার

ভাবমূর্তি এখন খুবই উজ্জ্বল। এসময়ে ওই লোকটাব উল্টো-পাল্টা বিবৃতিকে বেশী কভারেজ দিয়ে আপনারা আমার ভাবমূর্তিটা দয়া করে নষ্ট করবেন না।

ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে নতুন একটা অ্যাঙ্গেল দিন।

বললাম তো, নতুন অ্যাঙ্গেল বলে কিছু নেই। তবে আমি স্বীকার করছি, অজর্ন সেন নামক ওই খুনী লোকটা তার মেয়েকে খুবই ভালবাসত।

এবং মেয়েটিও তাকে ?

হ্যাঁ। আমার মেয়েও বাপের খুব ন্যাওটা ছিল। কিন্তু সে আমাকেও ভালবাসত।

আপনাদের ছোটো পরিবারে একটা লাভ ট্রাঙ্গল ছিল, একথা কি বলা যায় ?

নাঃ নাঃ। তা ঠিক নয়। আমি হিংসে করতাম না।

কিন্তু অজর্ন সেন বলছে, মেয়ে একটু বড় হওয়ার পর আপনি নানা সময়ে তার কাছে স্বামী সম্পর্কে এমন সব কথা বলতেন যাতে ওই শিশুর মন তার বাপের ওপর বিষিয়ে যায়।

মিথো কথা ! এসব খবরদার লিখবেন না। আমি মেয়েকে যা বলতাম তা একটুও বানিয়ে বলতাম না। ওর বাপ সম্পর্কে ওর একটা ভুল ধরনের উচ্চ ধারণা তৈরি হ'ছিল। সত্যের খাতিরে আমি সেই ভুলটা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করতাম মাত্র।

আপনি কি সে কাজে সফল হয়েছিলেন ?

খানিকটা।

আমি একটু গলা খাঁকারি দিয়ে সংকোচের সঙ্গে বললাম, আপনাদের সেক্স লাইফ সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

মল্লিকা সেনের প্রেতাত্মা খিলখিল করে হেসে ওঠে, সেক্স বলে ওর কিছু ছিল নাকি ?

ছিল না ?

নপুংশক বলা যায়। সেইটাই আমাদের অশান্তির আর একটা কারণ।

এ ব্যাপারটার জন্যও আপনি অজর্ন সেনকেই দায়ী করছেন তো ?

পূরোপূরি।

আপনার কোনোরকম শীতলতা ছিল না তো !

মোটাই নয়।

অজর্ন সেন বলেছে, সেক্সের সঙ্গে সাইকোলজির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। কোনো পুরুষের পক্ষেই স্ত্রীর কাছে অপমানিত হওয়ার পর তাঁর সঙ্গী উপগমন সম্ভব নয়। আপনি কি ওকে প্রায়ই অপমান করতেন ?

মোটাই নয়। অক্ষমরাই ওসব অজুহাত দেয়।

কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীরা বলছে, রোজ রাতেই আপনাদের তুমুল ঝগড়া হত।

তাতে ওদের কী ?

না, বলছিলাম ঝগড়ার ফলে অজ্জুন সেন অপমানিত বোধ করত এবং তার ফিজিক্যাল আর্জ' নষ্ট হয়ে যেত, এটা পাঠকরা কেমন খাবে ?

প্লীজ ওসব পয়েন্ট তুলবেন না । অশ্লীল ।

অশ্লীলতায় একটু আঁশটে গন্ধ থাকলে অ্যাঙ্গেলটা পাশেট যাবে ।

যাবে । কিন্তু তাতে আমার ভাবমূর্তি' নষ্ট হবে, প্লীজ ।

খুনটা তাহলে অজ্জুন সেনই করে ?

তবে আর কে ?

না, মানে এ ব্যাপারটা অজ্জুন করেনি । সে বলেছে, আপনি নিজের গায়ে, নিজের আগুন লাগিয়েছিলেন ।

তাতে কি ? ও তো ছুটে এসে আগুন নেভাতে পারত !

বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল । অজ্জুন সেন দরজাটা ভাঙার চেষ্টা করে প্রথমটায় পারেনি । যখন ভাঙে তখন আপনি পড়ে গেছেন ।

সে না হয় হল, কিন্তু প্ররোচনা ? নিষ্ঠুরতা ? খুন কি শুধু নিজের হাতেই করতে হয় ? মনস্তাত্ত্বিক চাপ নেই ?

অজ্জুন সেনও অনেকটা এইরকমই একটা কথা বলেছে ।

কী কথা ?

বলেছে, ফিজিক্যাল ডেথটা তেমন কিছু নয় । আপনি নিজের মবার অনেক আগেই নাকি অজ্জুন সেনকে ওই যে কী বললেন, মনস্তাত্ত্বিক চাপে মেরে ফেলেছিলেন ।

বলেছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ ।

আপনিও তাই লিখবেন ?

ভাবছি । অ্যাঙ্গেলটা বেশ নতুন ।

মোটাই তা নয় । ওর কথা বিশ্বাস করবেন না । আগুনটা ও নিজের হাতে লাগানি ঠিকই, কিন্তু সারাজীবন আমি ওর জন্যই জ্বলে পড়ে মরেছি । বিশ্বাস করুন । আমাকে ওই খুন করেছে । আমি চাই ওর ফাঁসি হোক ।

হলে ?

ওকে আমি কাছে পেতে চাই ।

কেন ?

মল্লিকা লাজুক গলায় বললেন, আঁহা, বোঝেন না যেন !

৩ আমি ও সে

আমি আর সে পাশাপাশি হাঁটিছিলাম, ডানদিকে কালো সমুদ্র। মেঘে ঢাকা আকাশ। প্রলয়ের আগের মতো থমথমে চারধার। উত্তাল ঢেউ এসে বেলাভূমিতে আমাদের পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে সরে যাচ্ছে।

সে জিজ্ঞেস করে, জীবনে তোমার সুখের মূহূর্ত কোনটি ?

আমি বললাম, কত ! কোনটার কথা বলব ?

একটার কথা বলো। একটা মূহূর্তের কথা।

সে কেমন সুখ ?

সে সুখের সঙ্গে কামনা নেই, লোভ নেই, অকারণ যে আনন্দ। আমি শিশুবেলায় একটা পিঁপড়েকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলি। আমার বাবা ছিলেন দয়ালু মানুষ। দৃষ্টি পেয়ে বলোঁছিলেন, ছোটো ছোটো প্রাণীরা নিজেদের রক্ষা করতে জানে না। ওদের মারতে নেই। তখন সেই মরা পিঁপড়ের জন্য আমি কাঁদতে লাগলাম। বাবা সেই পিঁপড়টার গায়ে মূখের ভাপ দিলেন। পিঁপড়টা— আশ্চর্য—বেঁচে উঠল। সেই আনন্দটার কথা আমার খুব মনে পড়ে।

না। ওটা সেই আনন্দ নয়। কৃতকর্মের জন্য অনুরোধচনা ও তা থেকে মুক্তি—এ তো স্বচ্ছ কারণ। এরকম সুখের কথা বলিনি।

প্রথম চুষনের কথা বলি ? একটি যুবতীর চোখ কেমন মায়াবী হয়ে গেল ? ঠোঁটে ঠোঁট সে এক আশ্চর্য স্বাদ। আমাদের ঘিরে বেজে যাচ্ছিল স্বর্গের বাজনা। এক অলৌকিক লিফট মতের ধুলো থেকে আমাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছিল মেঘের রাজ্যে।

স্বাভাবিক, নারী ও পুরুষ তো এর জন্যই সৃষ্টি। এ নয়।

শোনো। এক সুখের গল্প বলি তবে। আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিল আমার মা। তার সাংঘাতিক অসুখ হয়। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গেল। সে সময় হঠাৎ কোথা থেকে খবর পেয়ে এল এক হোমিওপ্যাথ। এক ডোজ ওষুধ। পরদিন মা যখন চোখ মেলে তাকাল আমার মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে আমি আর কিছুর চাই না। সে আনন্দের সঙ্গে পার্সা দিতে পারে এমন কিছুর আর ঘটেনি আমার জীবনে।

বুঝলাম। রোগ এবং রোগমুক্তি, প্রিয়জন বিরহ না ঘটা, এসব কারণ থাকলে চলবে না। শূন্য সুখের কথা বলো।

আমার কিছুর মনে পড়ছে না।

সমুদ্রের দিকে তাকাও। আদিগন্ত নিজেকে প্রসারিত কর। ভাবো, নিজেকে ভাবো। মনে পড়বে।

স্থলিত কণ্ঠে আমি বললাম, আদিগন্ত প্রসারিত করতে পারি তত বড় নয়
আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব ।

তবু ভাবো সমুদ্রের ঢেউ খুঁয়ে নিয়ে যাচ্ছে তোমার পা । আকাশকে দেখ ।
কী বিশাল ব্যাপ্তি দিয়ে ঢেকে আছে তোমাকে । কিছ্র মনে পড়ছে না তোমার !
পড়ছে ।

কী ?

সে অনেকদিন আগেকার কথা । আমি একবার হারিয়ে গিয়েছিলাম ।
আসলে ঠিক হারিয়ে যাওয়া নয় । আমার বাবা এক জঙ্গলে আমাকে বেড়াতে
নিয়ে যান । বাবা তালতলায় বসে ছবি আঁকছিলেন । আমি এক পা দূর পা
করে চলতে চলতে হঠাৎ একসময়ে টের পেলাম চারদিকে এক দুর্ভেদ্য অরণ্য
ঘিরে ধরেছে আমাকে । বাবার কাছে ফিরে যাওয়ার পথ আমি কিছ্রতেই
খুঁজে পাচ্ছিলাম না । সেই বয়সে হারিয়ে যাওয়ার মতো মমাতিক আর কিছ্র
নেই । চেনা পৃথিবীর গাউী ছেড়ে সে যেন অকুল দরিয়ায় পড়ে যাওয়া ।
সেখানে আছে ভূত প্রেত, ছেলেরা, দাতি, দানো, ডাইনী বৃদ্ধি, সাপ, বাঘ
কত কী । আমি আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে 'বাবা বাবা' বলে ডাকতে ডাকতে
অন্ধের মতো ছুটতে লাগলাম । কতবার পড়লাম, উঠলাম, কেটে ছড়ে গেল
হাত পা, সেই সময় আচমকা পাখি ডাকল । ঠিক উলুধ্বনির মতো শব্দ ।
আমি কান্না ভুলে শুনতে লাগলাম । পাখি ডাকছে । গাছপালায় বাতাসের
একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে । চারদিকে নেচে বেড়াচ্ছে রঙিন প্রজাপতি । কত
ফুল ফুটে আছে চারদিকে । আকাশ কী গভীর নীল ! মনে হয়েছিল কই
হারাইনি তো !

আজ ব্যথা নেই, রাষ্টি নেই, বিষমতা নেই

আমি বেশ ভাল আছি। পায়ের দিককার জানালা খুলে দেওয়া হয়েছে সকালে। আশোয়া হয়ে আমি বাইরেটা খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পায়ের কাছে খাটের রেলিং, তার ওপাশে জানালা, জানালার ওপাশে বৃষ্টিতে ধোয়া বাগানের গাছপালা। কাল রাতে খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ রোদ উঠেছে শান দেওয়া ইম্পাতের মতো ঝকঝকে, আকাশে উপচে পড়ছে নীল। বাগানের রঙে লেগেছে বনা সবুজের গভীর সমাহার। এদিকটা পশ্চিম বলে রোদ আমার মুখে পড়েনি। ভারী ভাল লাগছে, আজ গরম না শীত তা আমি বলতে পারব না। শরীরের ওইসব বোধ আমার হারিয়ে গেছে কবে। যখন তখন পেটের মধ্যে গদুমের ওঠে ব্যথা যখন মনে পড়ে দুরারোগ্য এবং দ্রুত ছিড়িয়ে যাওয়া এক দৃষ্ট ক্ষতে নষ্ট হয়ে গেছে আমার অন্ত ও যকৃত, পাচ যাচ্ছে পাকস্থলী ও মত্রাশয় তখন আমার আর শীত-গ্রীষ্মের কথা মনে পড়ে না, এমনকি অনেক সুখ-দুঃখের কথাও ভুলে যাই।

আজ আমি ভাল আছি। বাইরের বৃষ্টিতে থোয়া বাগানটি দেখে মনে হয়, আমি বেশ আছি।

আমার বউ রুমকিকে আপনারা অনেকেই চিনবেন। সে আকাশবাণী থেকে রবীন্দ্র সংগীত গায়। একসময়ে সে চমৎকার কথক নাচত, সংস্কৃতি সচেতন যে কোন লোকই রুমকিকে চেনে। প্রথম যৌবনে তার বহু পাণিপ্রার্থী ছিল। আর সেই সব প্রার্থীর প্রায় প্রত্যেকেই প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক। লাখপতি, কোটিপতির ছেলে বা প্রথম শ্রেণীর ইনিজিনিয়ার ও ডাক্তার, বিশিষ্ট অফিসার, খেলোয়াড়, কে নয়? সুন্দরী এই নায়িকাটির জন্য ছিল মাথায়, মাথায় তীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শেষ অবধি রুমকিকে আমিই পেয়ে যাই।

জীবনে এরকম জয় আমার অনেক। সায়েন মতে আমার রাশি বৃশ্চিক, এই রাশির জাতকেরা জয় করার জন্যই জন্মায়, তারা হারতে ভালবাসে না। নিজের জীবনটিকে আমি নানারকম ছোটবড় জয়লাভের যোগফল হিসেবে দেখি। ছোটখাটো পরাজয় যে ঘটেনি তা নয়, কিন্তু জয়ের সংখ্যাধিক্যে পরাজয় হার মেনেছে।

গত তিনদিন আমার কেটেছে এক ঘোরতর আচ্ছন্নতায়। তিনদিন আগে সন্ধ্যাবেলায় যখন বাথাটা শরু হ'ল তখন আমি পাগলের মতো মাথার চুল ছিঁড়েছি, চিৎকার করেছি। ডাক্তার এসে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। সেই

আচ্ছন্নতার মধ্যে আমি তেমন কিছু টের পেতাম না দিন ও বাত্ৰি, বাহির ও ঘর। তিন দিন পর আজ বৃষ্টিভেজা সকালে এই জাগ্রত অবস্থাটা আমি খুব উপভোগ করছি।

সকালে রুমকিকে আমি একবার দেখেছি। সে ঘরে এসে গভীরমুখে আমাকে দেখে কুশল প্রশ্ন করে গেল। তার চোখে গভীর বিষাদ ও ঘুমহীনতার ক্রান্তি। শরীর ধীরে ধীরে লাবণ্যহীন হয়ে যাচ্ছে নিরন্তর দৃশ্টিভ্রান্ত, বেশ রোগা হয়ে গেছে। তার ওপর সে আজকাল নানা অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম নিতে পারছে না। তার গানের স্কুল প্রায় বন্ধ হওয়ার উপরম।

রুমকি আত্ম বলল, এখন তো বেশ ভালো লাগছে? তোমার?

খুব ভাল, অনেকদিন এমন ভাল লাগেনি।

তাহলে আজ আমি গিয়ে গোটা কয়েক কাশ নিয়ে আসি। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যেকদিন ফিরে যাচ্ছে।

যাও।

নয়না রইল, দেখবে।

নয়না কে?

ওমা। নয়না নতুন নাম। কাল থেকে তাই তো, কাল তোমার জ্ঞান ছিল না। “জ্ঞান ছিল না” কথাটা আমার কানে খট করে লাগল। একটা অসুখের কাছে আমি হেরে যাছি ঠিকই। কিন্তু তা বলে সেটা ভাবতে আমার ভাল লাগেনি।

বললাম, ভেবো না। আমি ভাল থাকব। কিছুক্ষণ নিশ্চয়ই ভাল থাকব।

রুমকি আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে চলে গেল।

মাগর নার্সদের আমি চিনতাম। বলতে নেই রুমকির চেয়ে তারাই এখন আমার বেশী আপন। পেটের বাঁদিকে লাগানো একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে আমার যাবতীয় মল জমা হয়। তাছাড়া কাথোডার লাগানো রয়েছে তলপেটে পেছাপের জন্য। চমকপ্রদ ব্যক্তিদের অধিকারী, চটপট, দ্রুত উদ্ভাসিতশীল, সুদর্শন সেই যুবকটি আজ নানা নল ও হালির জালে জড়িয়ে পড়েছে। রুমকি তো এই লোকটিকে ভাল চেনে না। নার্সরা চেনে। তারা আমার সব নোংরা পরিষ্কার করে আমাকে স্নান করায়, খাওয়ার, ওষুধ দেয়, কখনো কখনো সাহায্যও দেয়। সেই সব নার্সদের মধ্যে একজন সুরমা। গর্ভবতী মেয়েটি ছেলে বিয়েতে ছুটি চেয়েছিল। বোধহয় আমার আচ্ছন্ন সময়ে সে বেচারী গেছে সন্তান প্রসব করতে। বদলে নতুন একজন বহাল হয়েছে। সুরমার জন্য আমার একটু শুন্যতাবোধ কাজ করছিল। ভারী ভাল ছিল মেয়েটি। কিন্তু এ আমার অকারণ, যুক্তিহীন প্রবণতা। আমি জীবনের যে পর্যায়ে পৌঁছেছি তাতে এ ধরনের প্রবণতা হাস্যকর।

আজ আমার বাথাটা নেই। এর চেয়ে বেশী আনন্দের খবর আমার কাছে

আর কিছু নয়। আমার দুইটি ছেলে নরেন্দ্রপদ্রর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে পড়ে। দুজনেই সাপ্তাহিক ব্রিলিয়ান্ট। দুই ছেলের চিন্তা একসময়ে আমাকে আনন্দ দিত। আজকাল তারাও গোণ হয়ে গেছে। গোণ হয়ে গেছে আমার যৌবনকালের অন্যান্য সফলতার আনন্দ। রূপ, রং, রেখা কিছুই আমাকে টানে না। আমার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী এক দুঃশীল অসহনীয় বাথা। আমি তার কাছে হেরে যাচ্ছি, ক্রমে ক্রমে। দম বন্ধ করা এক রিং-এর মধ্যে আমাদের মরণ-পণ লড়াই চলছে।

ইনজেকশন হাতে যে মেয়েটি ঘরে ঢুকল তার চোখ মুখ কেজো মানুষের মতো নয়। আমার যৌবনকাল ভরে আছে নারী-কুসুমের বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধে। এই ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা গভীর ও ব্যাপক, তাই স্বপ্নাতুর চোখের এই মেয়েটিকে দেখেই আমার মনে হল, যে কোনো সময়েই এ আমাকে তুলে ইনজেকশন দিতে পারে, খাইয়ে দিতে পারে উল্টোপাল্টা ওষুধ। সময় মতো পথ্য দিতে বোধহয় তুল করছে কখনো কখনো। কিন্তু একটু উৎসাহ দিলে ও আমাকে এমন সব রোমান্টিক কথা বলবে যা গুরুত্বের রুগীর মনকেও হাল্কা করে দিতে পারে।

আমি তাকিয়ে আছি দেখে মেয়েটা চমৎকার সাদা দাঁতে হাসল। বলল ভয় পাচ্ছেন? একটুও লাগবে না।

আমি জান একটু হাসলাম, ইনজেকশন—তা যন্ত্রণাদায়ক হোক আমি আর বাথা বলে কিছু টেরই পাই না। আমার ভিতরকার সেই বাথার কথা মেয়েটা জানে না। সেই বাথার চেয়ে নিরন্তর ইনজেকশনের ছুঁচ শরীরে ফুটো থাকলেও ভাল।

আমি বললাম, ইনজেকশনকে আমি ভীষণ ভয় পাই যে।

আমিও পাই। কিন্তু দেখবেন আমি এমন নরম হাতে দেবো, টেরই পাবেন না।

আমি শরীরটাকে বালিশের ওপর আরও একটু ছেড়ে দিয়ে বললাম, তোমার হাত বৃদ্ধি খুব নরম! দেখি।

আমি হাতটা বাড়তেই মেয়েটা অপ্রস্তুত হল একটু। রুগী হলেও আমার যৌবনকাল তো এখনো যায়নি। এই যুবতী কী করে হাতে হাত দেবে?

তবে সুখের কথা ও নাস। তাই অস্বস্তিটা কয়েক সেকেন্ড কাটিয়ে আমার সাদা রঙের হাসি হেসে বলল, হাত নরমের কথা বলিনি বলছিলাম, আমি ইনজেকশন খুব নরম করে দিতে পারি।

আমি সামান্য একটু দাপটের গলায় বললাম, হাতটা দাও। আমি দেখব।

ও হাতটা ভয়ে ভয়ে বাড়িয়ে বলল, কী দেখবেন?

দেখব, তোমার নখের নীচে ময়লা আছে কিনা। তুমি ভাল করে হাত ধুয়েছো কিনা। তোমার ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল। এবং তোমার বিয়ে কবে হবে।

মেয়েটা খুব হাসল, তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে আমার বিছানার পাশে একটা টুলে ঝুপ করে বসে পড়ে বলল, কোন্ হাত ?

ডানটাই দাও ।

সিরিঞ্জটা হাতবদল করে সে ডান হাতটা আমার হাতে দেয় । খুব চাপা গলায় বলে, উঃ, আপনি যা মজার লোক না ।

সুদূর বা অন্যান্য নার্সদের সঙ্গে আমি কখনোই এরকম লঘু ব্যবহার করিনি । গাড়ি, বাড়ি এবং শব্দ রোগওলা সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত মানুষের মতোই যথোচিত ব্যবহার করেছি । কিন্তু আজকের এই রোদের বানে ভেসে যাওয়া সকাল বেলাটায় কোথা থেকে এই স্বপ্নাতুর মেয়েটা এল ! ভারী হালকা হালকা লাগছে মন । আমার ভিতরটা আজ যন্ত্রণায় নয় ইয়ার্কিতে ভরে আছে ।

হাতটা নির্বিষ্ট হাতে ধরে আমি ওর কররেখার দিকে চেয়ে থাকি । হেড লাইন ধনুকের মতো বেঁকে সোজা ঢুকে গেছে চন্দের এলাকায় । তা ছাড়াও আছে সুস্পষ্ট কল্পনাপ্রবণতার রেখা । এ মেয়েকে স্বপ্ন ও পল্পবগ্রাহী কল্পনার হাত থেকে কে বাঁচবে ? আমি কেইরো ঘেঁটেছি অনেক ! হস্তরেখা তেমন না মানলেও থানিকটা জেনে রেখেছিলাম । মেয়ে পটানোব সহজ পন্থা হল হাত দেখা, এ পৃথিবীর যে কোনো মেয়েবাজই জানে ।

তোমার নাম নয়না ।

বেশী ইয়ার্কি করবেন না । কারো নাম তার হাতে লেখা থাকে না । বউদি আপনাকে বলে গেছেন ।

আমি তো বলিনি হাত দেখে তোমার নামটা ধরেছি ।

আচ্ছা, আর কী বলবেন বলুন ।

তোমার নখে ময়লা আছে ।

মোটাই না মশাই ।

আছে । তোমার প্রেমিকটি খুব গোঁয়ার লোক ।

যাঃ ! কী যে বলেন, না !

তোমার ইনজেকশন দেওয়ার হাত মোটেই নরম নয় । যাকে দাও সে আঁতকে ওঠে ।

এটাও কি হাতে আছে ?

হ্যাঁ । তোমার হাতটা রিজিড । কেন কারো হাতে হাত একেবারে সঁপে দিতে পার না ! জীবনে অনেক দৃখে পাবে এর জন্য ।

সত্যি ? ওমা, কী হবে তাহলে ?

হাত সমর্পণ করতে হয় । সেটা শেখো ।

কী ভাবে দেওয়া যাবে ?

বললাম তো, হাতটা শক্ত রেখো না ।

আপনি কিন্তু ভীষণ অসভ্য !

মজার লোক বলছিলে না ?

মজার লোকও ।

মজার লোকেরা একটু অসভ্যই হয় ।

এবার দেখুন । ইনজেকশনটা দিয়ে দিই ।

আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও । আগে দেখি তোমায় হাতে ইনজেকশন নেওয়াটা নিরাপদ হবে কিনা ।

ওমা, আমার কী হবে গো । আমি যে পাশ করা নার্স ।

না, তোমার হাত বলছে তুমি নার্সিং পাশ করোনি ।

সে কী ? আমার যে সার্টিফিকেট আছে ।

নকল সার্টিফিকেট, তুমি নার্সিং কিছই জানো না ।

কী করলে প্রমাণ হবে যে জানি ।

চুপ করে বসে থাকো । আমার চোখে চোখ রাখো । আমি তোমাকে হিপনোটাইজ করে জেনে নেবো ।

ও বাবা ! সে আমি পারব না । ভয় করে ।

আমার কী অসুখ হয়েছে জানো ?

নানান একটু বিবর্ণ দেখাল ঠাণ্ড । মাথাটা ওপর নিচে ঝাঁকিয়ে এলল জানব না কেন ?

কী বলো তো !

গ্যাসট্রিক আলসার ।

নার্স বা ডাক্তাররা রুগীর কাছে খুব মিথ্যে কথা বলে । কিন্তু যখন বলে তখন রুগীর কাছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয় । কিন্তু তোমার মত্বচোখ এই সামান্য মিথ্যে কথাটা বলতে গিয়ে ঝগাকাশে হয়ে গেল ।

মিথ্যে হবে কেন । আমি জানি ।

তাহলে বলব, তুমি সত্যিই নার্সিং জানো না । মিথ্যে কথা তো ভালভাবে লেতে পারোই না । তার ওপর আবার চিকিৎসার ধরন, ওষুধ রিপোর্ট'টা দেখে রোগ নির্ণয় করার যোগ্যতাও তোমার নেই ।

আচ্ছা ঘাট হয়েছে । এবার ইনজেকশনটা দিতে দিন ।

বলছি তো, আমি আনাড়ীর হাতে ইনজেকশন নেই না ।

বিশ্বাস করুন, আমি আনাড়ী নই ।

ভীষণ আনাড়ী । শোনো নয়না, আজ সকালে আমি খুব ভালো আছি । একটুও বাথা নেই । আমাকে ইনজেকশন দিও না । বসে থাকো, চুপ করে বসে থাকো শুধু ।

ডাক্তার মিত্র এসে যখন শুনবেন ইনজেকশন দেওয়া হয়নি, তখন ?

সাধে কী আনাড়ী বলি তোমাকে ? ইনজেকশনের ওষুধটা বেসিনে ফেলে দিয়ে এসো । আমি কিছু বলব না ডাক্তারকে । কেউ জানবে না, যাও ।

সত্যি বলছেন ?

সত্যি, আজ সকালটায় আমার নিজেকে রুগী ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

দেখবেন কথাটা ফাঁস হয়ে গেলে কিন্তু আমার ভীষণ বিপদ হবে।

আঃ, যাও যা বলছি করো।

নয়না উঠে গেল। ভয়ে ভয়ে। আমি এত লঘু স্বভাবের মানুষ নই। নয়নার চোখে আমি বয়স, মর্যাদা, শ্রেণী সব দিক দিয়েই অনেকটা দূরের মানুষ। কিন্তু তবু এই স্বপ্নাক্রান্ত কম বাস্তববোধসম্পন্ন এবং ছেলেমানুষ স্বভাবের মেয়েটির কাছে আজ আমার প্রগলভ হতে ইচ্ছে করছে।

না, মেয়েটি একাই কোনও কারণ নয়। এই উষ্ণতুল সকাল, কয়েকদিন বৃষ্টির পর এই রোদ, তিনদিন আচ্ছন্নতার পর আমার এই আমূল ভেঙ্গে ওঠা—এই সব কিছুর মধ্যে ওই মেয়েটিকে মানিয়ে গেছে। সুরমা হলে মানতো না।

নয়না ওষুধ ফেলে, সিরিঞ্জ ধুয়ে হাসিমুখে ফিরে এল। কৃতকর্মের জন্য কোনো দুঃখের ভাব নেই মুখে। হাসছে। হাত তুলে খোঁপা ঠিক করেছে। এই ভঙ্গীটা লঘু স্বভাবের মেয়েদের ভারী প্রিয়। খোঁপা ঠিক করার ছলে দু'হাত ওপরে তুলে তারা তাদের বক্ষপট দেখাতে ভালবাসে। মেয়েদের আমি গভীরভাবে জানি। এই বুক দেখানোর ভিতর দিয়ে তারা পুরুষের সপ্রশংস যৌনকাতর মৃদু দৃষ্টিকে কামনা করে। কিন্তু হায়, নয়না জেনেও জানে না, ওর বুককে চেয়ে অনেক বেশী জরুরী আমার কাছে ওর দু'টি চোখ। দুর্দৃষ্টি-হীন, উদ্বেগশূন্য, নির্লিপ্ত ও মজার ওই দুই চোখের দৃষ্টি সকালটার সঙ্গে মিলে যায়! বাথা নেই, বৃষ্টি নেই, বিষন্নতা নেই।

নয়না একটু ফস্টিনসিট ভালবাসে। ফের ঝুপ করে কাছ ঘেঁষে বসে পড়ে বলল, দেখুন না ভাল করে হাতটা। আর কী আছে।

আমি নির্বিকট চোখে ওকে একটুক্ষণ দেখে অনূচ্চ কর্তৃত্বের স্বরে বললাম, যাও, চা করে আনো।

চা। বলে বিস্ময়ে সে তাকায়। এ রুগীর চা খাওয়ার হুকুম আছে কিনা তা বোধ হয় সে ভাল করে জানে না। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ আমার গন্তীর মূখ ও কঠিন চোখ দেখে ভয় খাওয়া একটু হাসি হেসে উঠে পড়ল। বলল, যাচ্ছি যাচ্ছি। অত রাগ করবেন না।

চায়ের স্বাদ আমি বহুকাল ভুলে গেছি। পচন শব্দ হওয়ার পর আমার সিগারেটের আসক্তি চলে গেল। চা বা অন্য কোনো নেশারও আকর্ষণ রইল না আর। কিন্তু নয়নার করে আনা চাটুকু আমি আজ উপভোগ করছিলাম। বহুকাল আগে হারিয়ে যাওয়া চায়ের গন্ধ এবং স্বাদের একটু রেশ পাওয়া যাচ্ছিল।

নয়না আমার দিকে মিটিমিটে আলো-জ্বলা চোখে চেয়ে ছিল। বলল, আমি কি ভাল চা করছি?

ভাল। বহুকাল চা খাইনি।

চা দেওয়া বোধহয় খারাপ হল।

না, আমাকে যদি একটু এগিয়েই দিয়ে থাকো তাহলেও ক্ষতি নেই নয়না।
এখন আমার সামনের পথটুকু গড়ানো, ঢালু, বিকল একটা গাড়ি গাড়িয়ে যাচ্ছে।
তার থামার উপায় নেই। একটা সিগারেট এনে দিতে পারো?

ও বাবা, কি বলে রে লোকটা!

যাও নয়না এনে দাও।

নয়না অনিচ্ছার সঙ্গে গেল এবং যোগাড় করে আনলও।

নয়না।

উঃ।

হাতটা দাও।

আবার কী দেখবেন?

তুমি যথার্থ নাসিৎ জানো কিনা।

জানি না তো। বলেই দিয়েছেন একবার।

আমি আজ নাসিৎ বা ডাক্তার চাই না নয়না! আমার জন্য উদ্বেগ বোধ করে
এমন কাউকেই আজ আমার ঘরে আসতে দিও না। আমার প্রিয়জনদের মুখ
আমি দেখব না।

কি যে বলেন!

হাতটা দাও।

এই তো দিয়েছি।

বসে থাকো, চুপ করে বসে থাকো। আজ আমার বাথা নেই, আজ বৃষ্টি
নেই, আজ বিষণ্ণতা নেই।

ও আবার কেমনধারা কথা? কিছন্ন বুঝছি না যে।

তোমাকে বুঝতে কে বলেছে?

ও বাবা, বুঝতেও দেবেন না?

কথা বোলো না নয়না। মেয়েরা বেশী কথা বললেই বড় বোকার মতো
কথা বলে ফেলে। আজকের সকালটা নষ্ট করো না।

নয়না খুব হাসল। তারপর বলল, আপনি ভারি কিস্তুত।

সেটা আমি জানি।

হাতটা শুদ্ধ ধরে থাকবেন?

তাতে কিছন্ন মনে করবে নাকি?

না! আপনি ধরলে কিছন্ন মনে করার নেই।

কেন, আমি পুরুষ নই? প্রায়-যুবক নই?

নয়নার ছলবলে ভাবটা হঠাৎ কেটে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, কে
বলল নন?

যে কেউ বলুক, তুমি না বললেই হল ।

নয়না আমার দিকে মৃদু দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, আপনার মতো পুরুষ খুব বেশী দেখা যায় না ।

বটে ?

ঠাট্টা করবেন না কিন্তু । একটা কথা বলব ?

বলো নয়না, কিন্তু বোঝার মতো কিছ্ নয় তো !

না বোধহয়, বলিছিলাম সেই কী যেন হাত সমর্পণের কথা বলিছিলেন না !
বলিছিলাম !

আমার মনে হয় আপনার মতো কাউকে পেলে হাত সমর্পণ করতে মেয়েদের হয় না । হাত এগিয়ে যায় আপনা থেকেই ।

এ কথার পর একটু উজ্জ্বলতর হল আজকের সকাল, আমার অভ্যন্তরে বাথা ছিল না, শূন্য বাথার স্মৃতি ছিল, কিন্তু সেটাও মূছে গেল হঠাৎ । বিষন্নতার রেশটুকুও কেটে গেল । নয়নার হাতটা ধরে আমি সময়টা খুব উপভোগ করতে থাকি ।

দরজা খোলা । রুমকি এসে পড়তে পারে । বা অন্য কেউ । কিন্তু আমার ভয় করল না, এরকম সুন্দর ক্ষণ তো সকলের জীবনে আসে না । বড় ক্ষণস্থায়ী । তা হোক । ক্ষণস্থায়ী কী বা নয় ।

আমি আর নয়না বসে রইলাম । আজ বাথা নেই, বৃষ্টি নেই, বিষন্নতা নেই ।

প্রিয় মধুবন

মাথা অনেক শূন্য লাগছে আজকাল। অনেক বেশী শূন্য। যেন একখানা খোলামেলা ফাঁকা ঘর। মাঝে মাঝে শূন্য একটি কি দুটি শালিক কি চড়াইয়ের আনাগোনা। এরকম ভাল। এরকম থাকা ভাল। আমি জানি।

কালকেও আমার কাছে একখানা বেনামী চিঠি এসেছে। তাতে লেখা 'বিপ্লবের পথ কেবলই গাহ'স্থোর দিকে বেঁকে যায়। বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে!' লাল কালিতে লেখা চিঠি। নাম সই নেই, তবু হাতের লেখা চিনি। লিখেছে কুনাল মিত্র। আমার বন্ধু। এখনো বোধহয় ফেরারী। প্রায় দশ বছর তার খোঁজ জানি না।

আমাদের ডাকঘরগুলির কাছে বড় হেলাফেলা। চিঠির ওপর ঠিকঠাক মোহরের ছাপ পড়েনি। আমি কাল সারাদিন আতশ কাচ নিয়ে চেষ্টা করে দেখলাম। না, কোথা থেকে যে চিঠিটা ডাকে দেওয়া হয়েছে তা পড়াই গেল না। জানি যেখান থেকেই দেওয়া হোক ডাকে, কুনাল আর সেখানে নেই। সে সরে গেছে অন্য জায়গায়। রমতা যোগীর মতো ফিরছে কুনাল, কোথা থেকে কোথায় যে চলে যাচ্ছে! তবু বড় ইচ্ছে করছিল কুনাল কোথায় আছে তা জানতে।

কাল বিকেলের দিকে আলো কমে এলে আমি আতশ কাচ নামিয়ে রাখলাম। মাথা ধরে গিয়েছিল সারাদিন আতশ কাঁচের ব্যবহারে। তাই চোখ ঢেকে বসেছিলাম অনেকক্ষণ। ভুল হয়েছিল। সে তো ঠিক চোখ-ঢাকা নয়! টের পেলাম দুটি হাতের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে গড়িয়ে নামছে চোখের জল।

বিপ্লবের পথ কেবলই গাহ'স্থোর দিকে বেঁকে যায়! বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে! এ আমারই কথা। কুনাল কেবল কথাটা ফিরিয়ে দিচ্ছে। যেন ও কথার আড়ালে উঁকি মারছে তার সকৌতুক দয়াহীন মুখ—রাস্তা তুমিই দেখিয়েছিলে, ঘর থেকে বের করে এনেছিলে তুমিই তারপর সরে গেছে কোথায়। এখন কার এঁটো চেটে বেড়াচ্ছে মধুবন! তোমার ঘেন্না করে না?

চমৎকার এই সব শব্দভেদী বাণ কুনালের। মেঘের আড়াল থেকে লড়াই। প্রতিদিন পালটে যাচ্ছে তার ঠিকানা। আর আমি মধুবন—আমি বাঁধা পড়েছি স্থায়ী ঠিকানায়। কুনাল হয়ে গেছে ছায়া কিংবা মায়া। আমি এখন কোথায় পাবো তাকে? এ চিঠির তাই জবাব দেওয়ার দায় নেই।

কাল সন্ধ্যাবেলায় আমি ঘরের আলো জ্বালিনি। কুনালের চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিলাম। আমার বৃকের মধ্যে টিকটিকির বাসা! ঘর ছাড়ার

কথা মনে হলেই সে ডাক দেয় টকটিক টকটিক। যেও না। যাবো না যে তা আমি জানি। তবু চোখের জলে আমার দুহাতের আঙুল ভিজে গিয়েছিল। নিজের জন্য নয়, আমি কাল কুনালের জন্য কেঁদেছিলাম। তারপর ফাঁকা একখানা ঘরের মতোই শূন্য হয়ে গেল মাথা। মাঝে মাঝে একটি দুটি শালিক কি চড়ুইয়েব মতো ভাবনা ও স্মৃতি আনাগোনা করে গেল।

অনেকক্ষণ আমার বাইরের কোনো জ্ঞান ছিল না। তারপর আমার বউ সোনা আমাকে ডাকল 'রাজা, একটু এ ঘরে এসো।'

গিয়ে দেখি সে কাপড় পালটাচ্ছে। বলল, 'দেখ, আমি তোমাকে সারাদিন একটুও জ্বালাইনি। তবু এখন জিজ্ঞাসা করছি ও চিঠিটা কার? সারাদিন তুমি ওটা নিয়ে বসে আছো।'

আমি চিঠিটা এনে তার হাতে দিলাম।

ও দেখল। তারপর অবহেলায় চিঠিটা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, 'দেখ, কী বিচ্ছিরি রাউজ পরোঁছি! পিছন দিকে বোতামের ঘর। কিছূতেই আটকাতে পারোঁছি না, তুমি একটু বোতাম এঁটে দাও না।'

তখন সোনার সাজ আমি লক্ষ্য করলাম। কনুই পর্যন্ত হাতাওয়ালা একটা রাউজ পরেছে সে, গলায় আর হাতে খুব পাতলা লেস-এর ফ্রিল দেওয়া। রাউজটা আরো কয়েকদিন ওকে পরতে দেখেছি। কোনোদিনই বোতাম এঁটে দেওয়ার জন্য আমার ডাক পড়েনি। তাই মৃদু হেসে আমি ওর পিঠের দিকে বোতাম আর হুকগুলো লাগিয়ে দিলাম।

ও হাস্তে করে বলল, 'ইস, কী ঠাণ্ডা হাত!'

'ঠাণ্ডা।' আমি অবাক হয়ে বললাম 'কই!' বলে হাত দুটো ওর গালে রাখলাম।

মাথা ঝাঁকিয়ে সোনা বলল, 'না সে ঠাণ্ডা নয়! নিস্পৃহতার কথা বলছিলাম।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি : সোনা ধীরে ধীরে আঁচল তুলে নিচ্ছিল শরীরে। হঠাৎ মুখ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আদর!'

তক্ষুনি কুনালের চিঠিটার কথা একদম ভুল হয়ে গেল।

সোনার রাউজের বোতাম আর হুকগুলো আর একবার লাগিয়ে দিতে হল আমাকে।

তারপর সোনা টেবিলের ওপর থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে বলল, 'লাল কালিতে লেখা এই দেড় লাইনের চিঠিটা নিয়ে এখন আমরা কী করব? বাঁধিয়ে রাখব?'

হেসে বললাম, 'ঠাট্টাটা আমাকেই লাগল সোনা। চিঠির ও কথাগুলো একদিন আমিই বলতাম। বহুদিন পর অনেক খুঁজে খুঁজে আমার কাছে ফিরে এসেছে আমারই কথা।'

ও হ্রু কুঁচকে চিঠিটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'এটা কি তোমাকে ভয় দেখানোর জন্য?'

‘না, না!’ আমি মাথা নেড়ে হেসে উঠি ‘ওটা এমনিই ঠাট্টার ছলেই আমার কথা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া!’

সামান্য হিধা করে সোনা বলল, ‘চিঠিটার নাম-সই নেই। তবু তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি একে জানো। কে?’

একটু ভেবে বললাম, ‘ও বোধ হয় আমারই এক সন্তা। অতীত থেকে লিখে পাঠাচ্ছে।’

‘কবিতা!’ সোনা হেসে ফেলল, ‘এ তো কবিতা হয়ে গেল, রাজা!’ হাসি থামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, ‘আমি তো তোমার কাছে শূন্য ছিলাম যে আমি তোমার এক সন্তা। তোমার এরকম আর কটা সন্তা আছে, রাজা?’

হিংসুক। সোনা ভীষণ হিংসুক। ঘরে ওর রাজতন্ত্র। আমি ওর রাজা। ওকে এখন কিছুতেই বোঝানো যায় না যে একদিন আমি কুনালের ছিলাম প্রিয় মধুবন।

না, কুনালের প্রিয় মধুবন হওয়ার জন্য আর একবার পিছন-হাঁটার কোনো ইচ্ছেই নেই আমার। এখন আমি বেশ আছি। ফাঁকা, খোলামেলা শান্ত একটি ঘরের মতো শূন্য মাথা। মাঝে মাঝে এক আধটা শালিক কি চড়ুইয়ের আনাগোনা। এক আধটা ভাবনা, এক আধখানা স্মৃতি। তার চেয়ে বেশী কী দরকার। এখন আমার আলো বাতাস ভাল লাগে, ছুটির দিন ভাল লাগে, অবসর আমার বড় প্রিয়। আমার প্রিয় সেলাই কলের আওয়াজ, আমার শিশু-ছেলের কান্না, আলমারিতে সাজিয়ে রাখা পুতুল কিংবা ফুলদানিতে ফুল। আর বৃকের মধ্যে সেই টিকটিকির ডাক। যেও না। যেও না।

তবু মাঝে মাঝে যখন ভিড়ের মধ্যে রাস্তায় চলি তখন হঠাৎ বড় দিশেহারা লাগে। কিংবা যখন মাঝরাতে হঠাৎ কখনো ঘুম ভেঙে যায় তখন লক্ষ্য করে দেখি পাথর হয়ে জমে আছে আমার অনেক আক্ষেপ। আয়নার নিজের মুখ দেখে কখনো চমকে উঠি। মনে কয়েকটা কথা বৃষ্টির ফোঁটার মতো কোন অলীক শূন্য থেকে এসে পড়ে। তুমি যে এসেছিলে কেউ তা জানলই না! হায় মধুবন।

সত্য বটে এ সবই আবেগের কথা। নইলে আমার মনে স্পষ্ট কোনো আক্ষেপ নেই। না আছে পিছন-হাঁটার টান। খুব একটা স্মৃতিচারণও নেই আমার। মাঝে মাঝে সোনা এখন আমাদের ছেলেটাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যায়, বা বাপের বাড়িতে থেকে আসে একটি দুটি দিন, তখন কখনো সখ্যে সন্ধ্যাবেলায় বা রাত্রে আমি ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে চপ চাপ বসে থাকি। একটি দুটি কথা অন্ধকারে মশা ওড়ার শব্দের মতো গুনগুন করে যায়। আমি তৎক্ষণাৎ আমার বাচ্চা ছেলেটার কান্নার শব্দ মনে মনে ডেকে আনি, সোনার গলার স্বরের জন্য নিশ্চিন্ততার কাছে কান পেতে রাখি। আস্তে আস্তে সব আবার ঠিক হয়ে যায়। যদি কখনো হঠাৎ মনে হয় যে এবকম শান্ত জীবন হওয়ার কথা ছিল না

আমার. আরো দূরতর, ভিন্ন অনিশ্চয় এক জীবন আমার হতে পারত. তখন সঙ্গে সঙ্গে আমি হাতের কাছে যা পাই—হয়ত ওষুধের শিশি. ফাউন্টেনপেন কিংবা অন্য কিছু না পেলে হাতের আঙটির পাথরের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে মনকে একটা বিন্দুতে নিয়ে আসি। অতীত এবং ভবিষ্যৎ থেকে ফিরায়ে নিই আমার মূখ। আস্তে আস্তে বলি, এরকম ভাল। এরকম থাকাই আমাদের ভাল। তখন মাথা অনেক শূন্য লাগে। অনেক বেশি শূন্য। যেন একথানা খোলামেলা ফাঁকা ঘর।

অনেকদিন আগে কুনালের সঙ্গে আমার জীবন শেষ হওয়ার কিছু পরে ওই রকম লাল কালিতে লেখা বেনামী আর একথানা চিঠি এসেছিল আমার সঠিক ঠিকানায়। তাতে লেখা ‘জীবনে সৎ হওয়াই সব হওয়া নয়! আদর্শই সব! আদর্শ না থাকলে পুরোপুরি সৎ হওয়াও যায় না!’ প্রতিটি বাক্যের পর একটি করে বিস্ময়ের চিহ্ন। আসলে ওগুলো সর্বাধিক জিজ্ঞাসা। ছুঁচের মূখের মতো এই চিহ্নগুলো আমাকে বিধেছিল। আমারই বলা কথা আমাকে ফিরায়ে দেওয়া। সেই তার প্রথম বেনামা চিঠি। তারপর আমার বিষয়ের কিছু পরে আরো একথানা। এইরকম ‘বৃষ্টি হলেই মিছিল ভেঙে যাবে! দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে গাছতলায়। মাথা বাঁচাতে!’ কি জানি সে গাছতলায় বলতে এ ক্ষেত্রে ছাদনাতলায় বৃষ্টিয়েছিল কিনা। চিঠিটা আমি সোনাকে দেখাইনি। শূন্য মনে মনে বুঝতে পেরেছিলাম, সে আমার সব খবর রাখে, হৃদিস রাখে সঠিক ঠিকানায়। সে আমাকে ভোলেনি। সামান্য ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিল। কি জানি, আমি তাকে আরো তো কত কি শিখিয়েছিলাম। সে যদি সব মনে রেখে থাকে। তারপর ক্রমে বুঝতে পেরেছিলাম যে, তা নয়। এ তার আমাকে নিয়ে খেলা। আসলে পূর্বনো পদতুলের মতো ভেঙে সে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তার জীবন থেকে। মাঝেমাঝে সে কেবল দূর থেকে আমাকে ওইভাবে স্পর্শ করে দেখতে চায় আমি কতটা চমকে উঠি।

বলতেই হয় খেলাটা চমৎকার শিখেছে কুনাল। সে খেলতে জানে। গতকাল আমি সামান্য অনারকম হয়ে গেলাম। আজ সকালে তাই আমার মূখের দিকে ঘূমচোখে চেয়ে সোনা প্রথম প্রশ্ন করল, ‘আজও তুমি ওই ভুতুড়ে চিঠিটার কথা ভাবছো!’ চমকে উঠলাম। বস্তুত তা নয়। চিঠিটার কথা আমি ভাবছিলাম না. কুনালের কথাও না।

হেসে বললাম, ‘দূর’!

সোনা হাসল না। অনেকক্ষণ চুপচাপ করে ছেলের কাঁথা বিছানা গুঁছিয়ে রাখল, মশারি চালি করল, তারপর এক সময়ে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, ‘কোন ভোরে উঠে জানালার কাছে বসে আছো! এত সকালে ওঠা বৃষ্টি তোমার অভ্যাস!’

সে কথা ঠিক। ভোরে ওঠা আমার অভ্যাস নয়। কেন যে আজ অত ভোরে ঘুম ভেঙে গেল কে জানে। তাবপব আর ঘুম আসছিল না। শীতকাল, তবু লেপের ওম ছেড়ে উঠে গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে এসে আমি জানালার ধারে বসলাম। খুব কুয়াশা ছিল জানলাব নীচের রাস্তাটাকে মনে হচ্ছিল আবছান্নায় নিঃশব্দ নদী বয়ে যাচ্ছে। আব দুবের কলকাতা খুব উঁচু গাছের অরণ্যের মতো জমে আছে গ্রীষ্মে। সিগারেট ধবাত্তেই একটি দুটি পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। আমি প্রাণপণে সেগুলো ঠেকানোর চেষ্টা করেছিলাম। ঠেকানো গেল না। খুব ভোরে এগাদিন এক আগ্রমের কাঁজকে দেখেছিলাম ডান হাতখানি ওপরে তুলে চোখ বুর্জে আহবানী উচ্চারণ করতে 'তমসার পার অচ্ছেদ্যবৎ মহান পুরুষ ইষ্টপ্রতীকে আবিভূত, যদিবিদ্য চরণে তদুপাসনাতেই ব্রতী হই। জাগ্রত হও, আগমন কর। আমবা যেন একেই অভিজগন করি...। গান না। শব্দ টেনে টেনে উচ্চারণ করে যাওয়া। কবেকব কথা। তবু গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে। আমবা যেন একেই অভিজগন করি। ভোরের শান্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে আমার মনে হয়েছিল—হাব মধুবন! হাব, কুনাল।

আমি আমার আংটির মদরঙে গোমেদ পাথরটান দিকে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। আবহা অন্ধকাবেও পাথরটা চিকমিক করছিল। আমি আস্তে আস্তে আংটির গোমেদ পাথরটায় আমার মনকে স্থির করার চেষ্টা করছিলাম। তখন হঠাৎ—খোলা জানালা দিয়ে যেমন ঘবে মধে। উড়ে আসে পোকামাকড় - তেমনি অনেকদিন আগে শোনা কয়েকটা শব্দ বিদ্যুৎবেগে আমার মধে খেলা করে গেল। প্রথমে আমি কিছুক্ষণ ভেবেই পেলাম না এই শব্দগুলি কী, কিংবা কোথা থেকে এল। চেনা শব্দ। বড় চেনা। কয়েকটি মনে পড়ে গেল, এ আমার বীজমন্ত নাম কৈশোরে শেখা। এতকাল এ। মনেও ছিল না। মনে পড়তেই আমি আস্তে আস্তে উঠলাম। বীজমন্ত শব্দগুলি নিঃশব্দ মনে মনে খেলা করতে করতে সেই কৈশোরের ধ্যান অভ্যাস কব কথা মনে পড়ছিল। একটা সাদা-কালো চাদর ছবিব দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতাম। তারপব চোখ মজতেই সেই চরুটা ঘরনিচলে আসত দুই ত্রু মাঝখানে নাসিকার মূলে যাকে বলা হয় অজ্ঞাচক্র। অনেক শিখেছিলাম আমি। শেখতের পর আমাকে শিখতে হয়েছিল পড়ো-পাঠ আড়িক। দশটী ঘণ্টা কয়েকটা কণ্টের দিন কেটেছিল, যার মধ্যে দু'বি করে খেয়েছিলাম রসগোলা। মনে পড়ে এক শীতের খুব ভোরে দশটী ভাসা ত যাচ্ছি রাস্তাপথে, সঙ্গে জ্ঞাতিভাই তারা-প্রসাদ। হাফ-পাস্ট পরা তারা-প্রসাদ খাব উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলছিল। আমি তার দিকে একবার ঘাড় ফিরাই। গাফি বঢ়াল, মেয়ে জলের কাছে নেমে গেলাম। আমার পায়ে লেগে একটা মাটির খেলা আস্তে গড়িয়ে গায়ে টুপ করে জলে ডুবে গেল। বিবর্ণ মেটে রঙের জলে ভেসে যাচ্ছিল আমার ঘেরুয়া ঝোলা আর লাঠি। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম মাথাব ওপব ফিকে নীল আকাশ, আরুটারদিকেই মাটির

নরম রঙ। কোথাও এতটুকু আবেগ বা অস্থিরতা নেই। সব শান্ত ও উদাসীন, আর বাতাসে মিশে থাকা সামান্য কুয়াশার মৃদু নীল আভা। জলে আমাকে ঘিরে ছোটো ছোটো ঢেউে ভাঙার শব্দ। খুব সামান্য স্রোতে ধীরে ধীরে দূলে দূলে ভেসে যাচ্ছে গেরদুয়া ঝোলা সুন্দর আমার দশুড়ী। খুব দূরে তখনো নয়। বড় অশুভ দেখাচ্ছিল তাকে। যেন ডুবন্ত এক সন্ন্যাসীর গায়ের কাপড় ভেসে যাচ্ছে জলে। মনে হয়েছিল আর দূর এক পা দূরেই রয়েছে জন্ম-মৃত্যু ও জীবনরহস্যের সমাধান। আর মাত্র দূর-এক পা দূরে। আমার চারিদিকে বিবর্ণ মাটিরঙের ভলম্বল বৈরাগীর হাতের মতো ভিক্ষা চাইছে আমাকে। আর ইচ্ছে হয়েছিল আমার ওই দশুড়ী যতদূর ভেসে যায়, নদীর পাড় ধরে আমি ততদূর হেঁটে যাই। ফিরে গিয়ে কী লাভ? অনেকক্ষণ বাহাজ্ঞান শূন্য হয়ে জলে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে তারা প্রসাদ আমাকে জোর করে তুলে এনেছিল। তারপরও বহুদিন আমার সেই ঘোর কার্টেনি।

সেই কথা মনে পড়তেই আমি প্রাণপণে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করছিলাম আত্ম ভোরে। বীজমন্ডের যে শব্দগুলি মনে এসেছিল আমি সেগুলো নিয়ে খেলা করছিলাম। আর আমার আঙুর গোমেদ পাথরটায় স্থির করার চেষ্টা করছিলাম আমার সমস্ত অনুভূতি। বহুদিন বাদে কৈশোরের সেই পান করার ইচ্ছে পেয়ে বসেছিল আমাকে।

কুনাল জানে না তার চেয়ে আমি অনেক বেশী ফেরারী।

অফিসে বেরোনোর সময়ে সোনা মনে করিয়ে দিল 'আজ আমাদের বিশ্বের বার্ষিকী মনে থাকে যেন।'

মনে ছিল না। চার বছর হয়ে গেল। এখন আমার ছত্রিশ, আর সোনা বোধহয় আঠাশ পেরিয়ে এল। ঘড়ি ফিরিয়ে সিঁড়ির তলা থেকে আমি সোনাকে একটু দেখলাম, আমার দিকেই চেয়ে আছে। হাসলাম। ও হাসল। পরস্পরকে বোঝার চেনা পুরোনো হাসি। রাস্তার বোদে পা দিতেই সরগরম কলকাতার উত্তপ্ত ভিড়ের মধ্যে মন হালকা হয়ে যাচ্ছিল। একটা বোনামী চিঠির জন্য কাল আমার অফিস কামাই গেছে একথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছিল।

মিডলটন স্ট্রিটে আমার অফিস। দরজায় পা দিতেই টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বড়ো দারোগান। রিসেপশন কাউন্টারের চঞ্চল মেয়েটি মৃদু হেসে নড় করল। 'মনিং স্যার,' বলে জুনিয়ার একটি অফিসার হলের আর একদিকে চলে গেল। আমি লিফট নিলাম না। অনেকদিন পর একটু হালকা লাগছে আজ। আমি জুড়তোর শব্দ তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে দীর্ঘ সিঁড়ি পেরিয়ে উঠে এলাম আমার চারতলার অফিসে। টাইপিস্টদের ঘর থেকে অবিরাম টাইপ-মেশিনের শব্দ ভেসে আসছে। আমার ছোট অফিস ঘরটার বাইরে অপেক্ষা করছে আমার ছোকরা চটপটে স্টেনোগ্রাফার। আমি তার দিকে চেয়ে একটু হেসে ঢুকলে গেলাম ঘরে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঠান্ডা নিস্তব্ধ ছোট ঘরটা আমার। সবুজ কাচে ঢাকা টেবিল,

গভীর গদিওলা চেয়ার আর পিছনে প্রকাণ্ড কাচের জানালা। দূরে ময়দানের চেনা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। কোট খুলে হাঙ্গারে ঝুলিয়ে দিয়ে আমি কাচের শার্পিস খুলে দিলাম। হু হু করে ঠাণ্ডা পাতাস বয়ে এল। পাতা-পোড়ানোর ধোঁয়ার মৃদু গন্ধ। উদাস রোদ হাওয়া আর মৃদু ধোঁয়ার গন্ধ আমি আমার অন্তরে গ্রহণ করে নিচ্ছিলাম। বেশ চিৎরিত জীবন আমার। একটি দৃটি ছোটোখাটো অভাব বোধ এবং কখনো সখনো সামান্য একটু একঘেয়েমি ছাড়া কোনো গোল-মাল নেই। আমি সুখী। একটি ছোটো শ্বাস ছেড়ে আমি চেয়ারে ফিরে এলাম।

দুপুরে হঠাৎ এল সোনার টেলিফোন। তার গলার স্বর শুনতে চমকে উঠে বললাম 'কী হয়েছে?'

'কই! কিছুর না!' বলে ও হাসল 'তোমাকে উল আনার কথা বলেছিলাম, রাজা! মনে আছে? মনে করিয়ে দিলাম। তোমার কোটের ডানদিকের পকেটে নমুনা দিয়ে দিয়েছি। চার আউন্স এনো।

'দূর! আমি পারবো না। আমার আঁফিসের পর দোকানে ছোটোছুটি! তা ছাড়া উলের রঙ মেলানো বড় ঝামেলা।'

'পারবে।' বলে হাসল 'তুমি না পারলে চলবে কি করে? তুমি ছাড়া আমার কে আছে আর?'

মৃদু হাসলাম। আমাকে পটাতে সোনা ওস্তাদ।

একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আজ বিকেলের কথা মনে আছে তো! বলেই এবার হাসি ব'লো তো আজ কী?'

'আজ?' আমি একটু ভাবনার ভান করে বললাম 'আজ তো খোকনের জন্মদিন!'

'বদমাশ!'

'তাই না!'

'ঠিক আছে। তাই। শূধু সময়ে এসো।'

তারপর একটু চুপচাপ। টেব পেলাম ও ফোন তখনো ছাড়েনি। আমিও স্থিধা করছিলাম। তখন হঠাৎ ও বলল, 'রাজা, আমার ফোন পেয়ে তুমি চমকে উঠলে কেন?'

সামান্য গোলমালে পড়ে বললাম 'কই!'

'ভয় পেয়েছিলে?'

'কিসের ভয়!'

ও হাসে 'কিসের ভয় তার আমি কি জানি! বউ ছেলে চুঁরি যাওয়ার ভয় হতে পারে, ঘরে আগুন লাগার ভয় হতে পারে। কতো ভয় আছে মানুষের!'

বদমাশ বলে আমি ফোন রেখে দিলাম।

সত্যি যে আমি ভয় পেয়েছিলাম। সোনা যেভাবে বলল সেভাবে নয়। তবে অনেকটা অস্পষ্ট একটা ভয়।

বিকেলে আমি অনেক ঘুরে ঘুরে ওর ফরমাশী উল কিনলাম, আর আজকের দিন উপলক্ষ্যে ওর জন্য কিনলাম কালো জমির ওপর হলুদ আর সূর্যক রঙের এম্বরয়ডারী করা একটা কার্ডিগান, কিছু ফুল, গোটা দুই বাংলা উপন্যাস। বইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পা দিয়েছি, সে সময়ে—কোথাও কিছু ছিল না—তবু হঠাৎ মনে হল যদি এই অবস্থায় কোন-দিন কুনাল আমাকে দেখে! কে জানে বাইরের এত অচেনা লোকজনের মধ্যে সে গা-ঢাকা দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে কিনা! সে দেখছে তার প্রিয় মধুবনকে! পরনে সাট মধুবনের, উলের প্যাকেট, কাগজে মোড়া বউয়ের কার্ডিগান, হাতে ফুল আর উপন্যাস! কি জানি কেমন অস্বস্তি এল মনে, রজনীগন্ধার ডাঁটিতে আমি অকারণে বোকার মতো আমার মুখ আড়াল কবলাম।

পরমুহূর্তেই হেসে স্বাভাবিক হয়ে গেলাম আমি। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে কয়েক পলকের জন্য আমার দুর্বলতা এসেছিল।

সন্ধ্যাবেলায় আমাদের অনুষ্ঠান জমল খুব। আমার অনেক কালের বন্ধু অতীশ এসেছিল তার বউকে নিয়ে, আরো দু' একজন বন্ধু বান্ধব আর আত্মীয়-স্বজন। যখন সবাই চলে যাচ্ছে তখন সিঁড়ির গোড়ায় অতীশ আমাকে আলাদা ডেকে নিল, 'তোর সঙ্গে কথা আছে।'

আডাল নিয়ে গিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার রে? শুনলাম তোরা কাছে বোনমা একটা চিঠি এসেছে?'

মাথা নাড়লাম—হ্যাঁ। বললাম, 'হে বলল?'

'তোরা বউ।' ও হাসল, 'ও খুব ভয় পেয়ে গেছে। বলছিল কাল থেকে তুই নাকি কেমন অন্যরকম হয়ে গেছিস। কে'দে'ছিস।'

হাসলাম 'দূর।'।

অতীশ মীচু গলায় প্রশ্ন করল 'কে লিখেছে?'

বললাম 'কুনাল। কুনাল মিত্র।'

'ওঃ!' বলে একটু ভাবল অতীশ। 'বছর চারেক আগে সে আর একবার তোকে চিঠি দিয়েছিল না?'

'হ্যাঁ। আমার বিয়ের ঠিক পরেই।'

'এবার কী লিখেছে সে?'

আমি বললাম 'অনেকদিন আগে আমি তাকে শিখিয়েছিলাম : সাবধান। বিপ্লবের পথ কিন্তু কেবল গাছ'স্থার দিকে বেঁকে যায়। বনের সম্মার্সীও ফিরে আসে ঘরে। সেই কথাই সে ফেরত পাঠিয়েছে আমাকে।'

হাসল অতীশ 'তোকে টিঙ্গ করেছে, না?'

আমি মাথা নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ।

ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল অতীশ 'ওর বেশী আর কিছুই কুনালের করার নেই।'

আমি চেয়ে রইলাম অতীশের মুখের দিকে ।

অতীশ ম্লান হাসল 'মধুবন, আমি কুনালের খবর রাখি । বছরখানেক আগে তার খবর পেয়েছিলাম । হাওড়া জেলার মফঃস্বলে একটা কারখানায় সে চাকরি করছে । দৃংখ কণ্ঠে আছে । আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল । আমি তাকে তোর কাছে আসতে বলেছিলাম । তুই বড় চাকরি করিস । সে মাথা নেড়ে জানাল আসবে না । বলেছিল আমার খবর মধুবনকে দেবেন না । আমি কথা দিয়েছিলাম । আজ কথা ভাঙতে হল মধুবন, নইলে হয়ত তোর শান্তি থাকত না ।'

একটু চুপ করে থেকে অতীশ আবার বলল 'ভাবিস না মধুবন । এই সব ছোটোখাটো চমক সৃষ্টি করা ছাড়া ওর জীবনে তো আর কিছ্‌র এখন করার নেই । ওরও ছেলেপুলে নিয়ে বড় সংসার, তোর খোঁজখবর রাখার সময় তেমন নেই । তবু মাঝে মাঝে ওই সব চিঠি পাঠায়, পাঠিয়ে মজা পায় ।'

কুনালকে প্রায় হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়ে অতীশ চলে গেল । আমি নিঃশব্দ ঘরে ফিরে এলাম । দেখি ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে সোনা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে । আমার দিকে ফিরে এক বলক হেসে বলল, 'কি গো কুনাল মিত্রের বন্ধু, ভূতপূর্ব বিপ্লবী, এবার একটু সাহস কর ।'

হাসলাম । বুঝলাম অতীশ চিঠিটা আন্দাজ করে সোনাকে সব বলে গেছে । তবু কি করে আমি সোনাকে বোঝাবো যে আমি এখনো সুখী নই ।

কুনাল কতদূর বিপ্লবী ছিল, সঠিক ফেরারী ছিল কিনা তা নিয়ে আমার একটুও মাথা ব্যথা নেই । আমি স্বেচ্ছায় সরে এসেছি অনেক দূরে । এখন নিশ্চিন্ত জীবন আমার । তবু মাঝে মাঝে একজন ফেরারীর কথা ভাবতে আমার ভাল লাগে । রাজনীতির জন্য নয়, বিপ্লবের জন্যও নয়, এ সব কোনো কিছুর জন্যই এখন আর আমার একটুও বাস্তুতা নেই । এখন আমার প্রিয়—সেলাইকলের আওয়াজ, আমার শিশু ছেলের কান্না, আলমারিতে সাজিরে রাখা পুতুল কিংবা ফুলদানিতে ফুল । কেমন মাঝে মাঝে এ সবের ফাঁকে ফাঁকে একটু বিমনা হয়ে ভাবতে ভাল লাগে আমারই এক সন্তা পালিয়ে ফিরছে মাঠে-জঙ্গলে ক্ষেতে-খামারে, পাহাড়ে-পর্বতে । কুনালের কথা শুনে তাই আমি একটুও খুশী হইনি, অবাকও নয় । আমি তো জানতাম বিপ্লবের পথ গাহ'স্থ্যর দিকে বেঁকে যান্ন । বনের সন্ন্যাসী ফিরে আসে ঘরে ! আমি তো তা জানতাম ।

রাতে শুয়ে আমার মুখের ওপর বন্ধে পড়ে সোনা বলল 'কণ্ঠ পাচ্ছে ?'

চমকে উঠে বলি 'কই । কিসের কণ্ঠ ?'

'আমি জানি । পাচ্ছে ।'

'কেন ?'

'কি জানি ।' বলে একটু চুপ থেকে বলল, বোধ হয় তোমার মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছা করে, না ? এমন উপদেশহীন নিশ্বেজ জীবন তোমার ভাল লাগে না । আমি জানি ।'

‘দূর!’ বলে জোরে হেসে উঠলাম। তবু সোনার মুখ সামান্য বিবর্ণ দেখাচ্ছিল।

‘বড় ভয় করে গো।’ ঘুমের আগে আমার আদরে তলিয়ে যেতে যেতে সোনা বলল। অমনি আমার বুকের মধ্যে টিকটিক টিকটিক! যেও না। যেও না।

নিঃসাড়ে ঘুমের ভান করে অনেকক্ষণ পড়ে থেকে আমি গভীর রাতে উঠে লেখার টেবিলে ছোটো বাতিটি জেলে বসলাম। কুনালকে একটা চিঠি লেখা দরকার। চেনা কুনালকে নয়। এ খার এক কুনালকে, যাকে আমি চিনি না।

সারা রাত ধরে আমি লিখলাম আমার চিঠি, সিগারেটের পর সিগারেট জেলে। তারপর টেবিলের ওপরেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। ভোরবেলা সোনা আমাকে ডেকে তুলল। তার চোখে মুখে ভয়, ঠোঁট কাঁপছে কান্নায়। ‘কাঁ করছিলে তুমি রাজা? সারারাত...সারারাত ধরে!’

আমি সুন্দর করে হাসলাম। তারপর হাঁকতে দেখিয়ে দিলাম চিঠিটা। ও প্রথম বদ্ব্যভূতেই পারল না।

বললাম ‘সারারাত ধরে আমি এ চিঠিটা লিখছি সোনা। বেনামী একটা চিঠি।’

‘ওমা! ও সবকে হয়ে বলল ‘এ তো মাত্র একটা লাইন!’

আগার কাঁধের ওপর দিয়ে বুক পড়ে ও শব্দ করে চিঠিটা পড়ল ‘ওরে কুনাল বনেট সন্ন্যাসীর চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশী।’

আমি সুমন

আমি জানি ভিনি আমাকে ভালবাসে। ভালবাসে বলেই ভিনি বার বার আমার কাছে ধরা পড়ে যায় : নাকি ইচ্ছে করেই ধরা দেয় কে জানে ! তার সঙ্গে প্রথম দেখা সেই শিশু বয়সে। তখন ও ফ্রক পরে, লালচে আভার এক ঢল ঢল আর ঠোঁটের ওপরে বাঁ ধারে একটা আঁচিল, খুব ফর্সা রঙ—বাস, আর কিছুর মনে নেই।

প্রথম দিন, পনেরো ষোলো বছর পরে প্রথম দিন ভিনি আমার দিকে তাকালই না। কিংবা তাকিয়ে এক পলকেই সব দেখে এবং জেনে নিয়ে নিশ্চিত হয়ে ভালমানুষ সেজে গেল নিজের মার সামনে, কে জানে। বসল খাটের ওপর জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে।

সুমন, এই হচ্ছে ভিনি। ওর মা বললেন, তাঁর চোখেমুখে অহঙ্কার বলমল করছিল, আরো অনেক নিঃশব্দ কথা ছিল তাঁর মুখে যা তিনি বললেন না, আমি বুঝে নিলুম—দেখো ত আমার ভিনি কী সুন্দর হয়েছে। দেখো ওর আঙুল, ওর চুল, ওর মুখের ছাঁদ, কথা বলে দেখো কী সুন্দর মিষ্টি ওর গলাব স্বর, রাজপুত্রের যুগ্ম আমার ভিনি।

এই সব কথা ভিনির মায়ের মুখে লেখা ছিল কিংবা বলা ছিল। আমি বুঝে নিলুম সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে নিজের জন্য লজ্জা হচ্ছিল আমার। আমি তেমন কিছুর হলুম না কেন। ভিনির বয়স হয়েছে বিয়ের, তবু কোনোদিন ওর অভিভাবকেরা আমার কথা ভাববে না—আমি বুঝে গেলুম প্রথম দিনের কয়েক মিনিটেই। মনে মনে বললুম—পালা সুমন, মনে মনে যোগী ঋষি হয়ে যা। ছেলেবেলায় তুই যে সুন্দর ছিলা একথা অনেকেই ভুলে গেছে। এখন কাঠুরের মতো চেহারা তোরা, গুন্ডাদের মতো ছোট করে ছাঁটা চুল, মুখের ভাব চোর-চোর, কাঠ হয়ে বসে আছিস।

কতদিন দেখা নেই ! ভিনির মা বলে—কি করে আমাদের ঠিকানা পেল :

সেটা আমার গল্প কথা ! তাই বললুম না, হেসে এড়িয়ে গেলুম। বুঝলুম ভিনি যে আমাকে তিনটে চিঠি লিখেছিল পর পব তার কথা ওর বাড়ির কেউ জানে না। তার প্রতিটিতেই লেখা ছিল—একবার আসবেন। আপনাকে বড় দরকার আমার। আমারও প্রশ্ন—আমার ঠিকানা ভিনি পেল কোথায় !

দরকারটা আমি বুঝতে পারছিলাম না, কেননা ভিনি জানলার বাইরে মুখ ঘুরিয়েই ছিল। অথচ পনেরো-ষোল বছর পর দেখা, তারও আগে দরকারের চিঠি দেওয়া !

চা খেয়ে আমি উঠে পড়লুম—চলি।

আবার আসবে তো ! ভিনির মা বলল—আমরা আর তিন চার মাস কলকাতায় আছি। উনি রিটার করলেন, হেতমপদে ঠুঁদের দেশেই আমাদের বাড়ি তৈরী হচ্ছে, দু' তিনটে ঘরের ছাদ বাকী, ছাদ হলেই আমরা চলে যাবো। এর মধ্যেই এসো আবার। মা বাবা কেমন ? বলে হাসলেন—কতদিন ঠুঁদের দেখি না।

হ্যাঁ আসবো বলে বেরিয়ে আসছিলাম, মনে মনে তাগাদা দিচ্ছিলাম নিজেকে—পালা সুমন, ভীতুর ডিম, আর আসিস না কখনো।

সিঁড়িতে পা দিয়েছি যখন তখনই গলার স্বর শুনলাম—আমি অহংকারী নই।

এক বালক ফিরে দেখলাম—পিছনে সেই লালচে চুলের ঢল আধো আলোতেও বলমল করছে মদ্য। পাশে ওর মা দাঁড়িয়ে। তবু সঙ্কেচ নেই কেবল ওর মায়ের মুখে একটু শূকনো ভাব আর জোরকরা হাসি।

পালালাম।

। দুই ।

এতকাল আমি শান্তিতে ছিলাম। ছোট্ট একটা ঘর আমার। ছায়াময়, একটু গলির ন্তরের নির্জনে। সারাদিন প্রায়ই কথা না বলে কাটানো যেতো। লোকে আমার নাম জানে না, খুব কম লোকেই আমাকে চেনে। আমি নিজের কাছেই নিজের সুমন।

বাড়িওয়ার বৌ বলল—আপনার কাছে একজন এসেছিল।

—কে ? অনামনস্ক আমি সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ঘাড় না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

চমকে মদ্য ঘুরিয়ে দেখি বাড়িওয়ার বৌয়ের মুখে একটু সবজাত্তা হাসি। ওঁর অনেক বয়স তবু হাসিটা সুন্দর দেখাল—মায়ের মতো হাসি।

দুটো সিঁড়িতে দু' পা রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

—খুব সুন্দর। বাড়িওয়ার বৌ বলল—কে ?

বুঝতে পারছিলাম। তবু জিজ্ঞাসা করতে ভয় করছিল—ছেলে না মেয়ে।

—ভাবসাব দেখে মনে হল আবার আসবে। বাড়িওয়ার বৌ বলল—আমাদের ঘরে বসিয়ে রেখেছিলাম অনেকক্ষণ। চা করে খাইয়ে দিগোছি। কথাবার্তা বেশী হয়নি, ভয় নেই।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললাম না। অন্ধকারকে ডেকে বললাম—ধরা পড়ে গেছে। রাতে শূতে গিয়ে কষ্টটা টের পেলুম। বন্ধকে পেটে কিংবা কোথায় যে

একটা বিশ্রী বাথা ছোট্ট একটা মাছের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে! ঘুম আসছিল না। কেবল ভয় আর ভয়! কিছুর একটা ঘটবে আমি টের পাচ্ছিলাম।

আমি এইরকম।

খুব বড় একটা বাড়িতে অনেক অপোগন্ড ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমার ছেলেবেলা কেটেছিল। তারা সব আমার জেঠতুতো খুড়তুতো পিসতুতো ভাইবোন—অনাদরের রুদ্ধ চেহারা তাদের, ঝাকড় মাকড় চুল, গায়ে তেলচিট ময়লা, ঝগড়াটে হিংসুটে। প্রকাণ্ড ঘরের মেঝেয় ঢালাও এজমালি বিছানায় শাতে যাওয়ার সময় তাদের জায়গা নিয়েও ঝগড়া হত। বাড়িটাকে বড় বললাম। কিন্তু হিসেবে ধরলে বাড়িটার এলাকাই ছিল বড়, বড় উঠোন ভিতরে, বাইরে বড় কান্দুপের পিঠের মতো ঢালু একটা মাঠ। ভিতর বাড়িতে বড় উঠোন ঘিরে কয়েকখানা ঘর—যাদের নাম ছিল পূর্ব পশ্চিম উত্তর বা দক্ষিণের ঘর। এক উত্তরের ঘর ছাড়া আর কোন ঘরেই পাকা ভিত ছিল না। আমাদের বাড়িটা যে লক্ষ্মীছাড়া ছিল, কিংবা আমাদের যে খুব অভাব ছিল তা নয়। বরং উল্টোটাই। আমাদের অনেক ছিল। শুধু আশ্রিত আত্মীয়স্বজন আর যোথ থাকার চেঁচায় যে ভীড় বেড়েছিল তাইতেই বাড়িটার মধ্যে সব সময়ে ছিল একটা দিশেহারা ভাব। অনেক ছেলেমেয়ে ছিলুম আমরা, যাদের কেউ কেউ পরে অনেক বড় কিছু হয়েছে। কিন্তু অতগুলোর মধ্যে কখন কোনোটার হাত-পা ঝাটল, কোনোটা পড়ে মরল, কোনোটা পুকুরে ডুবল এই চিন্তায় একটা 'গেল গেল' ভাব সবসময়ে আমাদের বাড়িটার টের পাওয়া যেত। আমার দাদুর কোনো টিলেগি ছিল না—তিনি সবসময়ে কৌটোর মুখ ভাল কবে আটকাতে, দরজার হুড়কো দিতেন ঠিক মতো, আর সন্ধ্যাবেলা আমাদের গুনে গুনে ঘরে তুলতেন। মা-বাবার কাছে শোয়ার নিয়ম ছিল না, আমরা উত্তরের ঘরের মেঝেয় শুতুম একসঙ্গে, দাদু থাকতেন চৌকিতে, বিড় বিড় করে বীজমন্ড কলতেন দাদু ঠাকুরার সঙ্গে, ছোট্ট খাটো বচসা হত, আর ঘুম ভেঙে রাতে মাঝে মাঝে শুনতুম দাদুর গুড়ুক গুড়ুক তামাক খাওয়ার শব্দ।

আমাদের পরিবারে নাম রাখার একটা রীতি ছিল; আমার আগের ভাইদের নাম রাখা হয়েছিল অনিমেঘ, হৃষিকেশ, পরমেশ, অজিতেশ, সমরেশ ইত্যাদি। সব মিলিয়ে প্রায় উনিশজনের ওরকম নাম রাখা হয়েছিল। আমার বেলায় আর নাম পাওয়া যাচ্ছিল না। শোনা যায় অনেক ভাবনা চিন্তার পর আমার বড়দা রায় দিয়েছিলেন মাত্র দুটি নাম বাকি আছে আর। স্যুটকেস আর সন্দেশ। কোনটা পছন্দ বেছে নাও। আমার ধর্মবিশ্বাসী মেজকাকা আমার নাম দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ধর্মেশ। সেটা বাতিল করে দাদু আমার নাম রাখলেন সুমনেশ। ভাল মনের অধিকারী। কেউ মুখে কিছুর বলেনি কিন্তু অনেকেরই পছন্দ ছিল না নামটা, আমার মায়েরও না। তাই কালক্রমে আমি শুধু সুমন হয়ে উঠেছিলাম।

আমি সুমন ভাল মনের অধিকারী।

ঐ বাড়িতে খুব বেশী বড় হয়ে উঠবার আগেই আমরা বাড়ি ছেড়েছিলাম। আমার বাবা চাকরী নিয়ে চলে গেলেন বিহারে। প্রকাশড বাগান ঘেরা বাংলা-বাড়িতে এসে আমার সেই পাঁচ সাত বছর বয়সে প্রথম হঠাৎ মনে হয়েছিল— আমার জীবন খুব একার হবে, না, হঠাৎ নয়? সেই বাড়িতে প্রথম সকালবেলায় আমি বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখতে ছুটে বেরিয়েছিলাম। একা। সামনে পাপি ফুলের বাগান, তারপর ছোট মসৃণ লন, তারপর আগাছা আর রাঙা চিতার বেড়া। আমি দৌড়োতে গিয়ে থমকে গেলুম—যত যাই ততই একা। কেবল একা। শিমূল গাছ থেকে হঠাৎ হু-হু করে কেঁদে উঠল একটা কোকিল। ওরকম ডাক আমি আর কোনদিন শুনলুম না। হাজার বছরে কোকিল বোধহয় ওরকম ডাকে। আমি কি অনেক কোকিলের ডাক শুনিনি। তবু আমাদের দেশের এজমালি বাড়িতে অনেক অপোগন্ড ছেলেমেয়ের ভীড়ে কখনো আমি কোকিলের ডাক শুনিনিলাম বলে মনে পড়ে না। একা ভোরের ভেজা বাগানে দাঁড়িয়ে আমি প্রথম একটি কোকিলকে ডাকতে এবং কাঁদতে শুনলুম। সেই মৃহাতেই একা একটি কোকিল আশে তার ডাকের সঙ্গে আমার মিলমিশ হয়ে গেল। মনে হল আমার জীবন খুব একার হবে! সেই ভোববেলাটির কথা আজও আমার খুব মনে পড়ে। ঐ রকম একটি কোকিলের ডাক কিংবা আরো তুচ্ছ একটি দৃষ্টি ঘটনা থেকে আমরা আবার নতুন করে আমাদের যাত্রা শব্দ করি। করি না। আমার এতদিনের বিশ্বাস ছিল—আমার জীবন খুব একার হবে!

আমি আমার বাবাকে সাদা জিনের প্যান্ট পরে ক্রিকেট, টেনিস খেলতে দেখেছি। তবু বাবার ছিল সাধু-সন্ন্যাসী-জ্যোতিষ আর তুক-তাকের বাতীক। খুব লম্বা সুন্দর সাদা চেহারার এক ভদ্রলোক, যার পরনে গেরুয়া আলখাল্লা আর চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, আমাকে দেখে বলিছিলেন—এ ছেলের স্বাভাবিক ছবি-অঁকার হাত আছে। এর মন একটু দার্শনিক। বলে তিনি চুপ করে থেকেছিলেন।

বাবা প্রশ্ন করলেন—আর?

উনি হেসে বললেন—একটু দেখে রাখবেন এ ঘর ছেড়ে পালাতে পারে। সন্ন্যাসের নিকে খুব টান।

—আর; বাবার ডু কুঁচকে উঠল। দরজার আড়ালে মা ছিল। হঠাৎ তার হাতের চুড়ির বনাত শব্দ হয়েছিল। আমি বুকোঁছিলাম, আমি সেই বয়সেই বুকোঁছিলাম, লোকটা ভুল কথা বলছে না।

উনি একটু ভেবে বললেন, ওকে খুব সবুজের মধ্যে রাখবেন। ওর পোশাক যেন হয় সবুজ, ওর খাবারের মধ্যে বেশীর ভাগ যেন হয় সবুজ রঙের, ওর চিন্তায় সবুজের প্রভাব যেন বেশী থাকে দেখবেন।

তার পরদিনই রঙ সাবান কিনে এনে মা আমার সমস্ত পোশাক সবুজ করে

তুলেছিল। রাশি রাশি শাকপাতা অনিচ্ছায় খেতে হত আমাকে। লুডো খেলতে বসেছি, মা ছুটে এসে বলত—সমন বাবা, তুই সবুজ ঘর নে। বাড়িতে পোষা বুলবুল ছিল, তার পাশে এল একটা টিরাপাখি। ক্রমদিনে এক বাক্স জল রঙ কিনে দিয়ে মা বলল—কেবল গাছপালার ছবি আঁকবি।

তবু আমার জানা ছিল যে, আমার জীবন খুব একর হ'বে। সবুজ রঙের ভিতরেও একটি উদাসীন মমতা আছে! আমার মা কিংবা বাবা তা ধরতে পারেনি।

॥ তিন ॥

আমার চোখে চোখ রেখে শান্ত একটু হেসে ভিনি বলল—তারপর ?
কি ?

—তোমার চোখ দেখলেই মনে হয় কোথাও একটু বিপদের আভাস দেখলে তুমি হরিণের মতো ছুটে পালাবে। সুমন, লক্ষ্মীসোনা, আমাকে ভয় পেও না। তোমার জন্য আমি অনেক কষ্ট করেছি।

আমি হাসলুম। কি জানি !

আমি সুমন। ভাল মনের অধিকারী। তবু আমি জানি ভিনির জন্য আমাকে কেউ ভাববেই না। ছেলেবেলা থেকেই ভিনি এরকম কথা শুনছে তার মা কিংবা আত্মীয়দের কাছে—সুন্দরী ভিনি, তোমার জন্য এনে দেবো সোনার রাজপুত্ৰ।

কিন্তু আমি কেবল সুমন। কেবলমাত্র সুমন। নিজের কাছে আমি নিজেকে বড় প্রিয়। আমি বরং পালিয়ে যাবো, লুকিয়ে থাকবো, পা টিপে ছাটবো, লোকালয়ে যাবো না, তবু কেউ যেন কোনো কিছুর জন্য আমায় অনাদর না করে, অপমান যেন না করে আমায়। বরং বলি—তোমাদের সুন্দর ভিনিকে নিয়ে যাও। আমি কিছুরই চাই না। আমি আমার বড় আদরের সুমন, বড় ভালবাসার। আমার সামনে আমার সুমনকে অনাদর করো না, বাতিল করে ফেল দিও না। বরং নিয়ে যাও তোমাদের সুন্দর ভিনিকে।

ভিনি আমার খুব কাছে এসে বলল—সুমন মনে নেই তোমার বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে তোমাদের বাড়িতে এক দিন আর এক রাত ছিলুম আমি ! সন্ধ্যাবেলা মায়ের কথা মনে পড়তে আমি খুব কেঁদেছিলুম। তুমি খেলার মাঠ থেকে ফিরে এসে আমার কান্না দেখে খুব খেঁপিয়েছিলে। মনে নেই ? তখন তোমার দু' হাত তুলে নাচ, নকল কান্না আর মূখের কাছে মূখ এনে চোখ বড় করে তাকানো দেখে কান্না ভুলে আমি খুব হেসেছিলাম।

মনে নেই। হেসে বললুম—খেঁপিয়েছিলুম বলে আজো আমার ওপর রাগ

পুষে রাখানি তো ভিনি ?

ও চোখ বৃজে সোজা হয়ে বসে রইল, তারপর বলল—আমার গা-দেখ ।

দেখলুম গায়ের কাঁটা দিয়েছে ।

ও চোখ বৃজেই সামান্য হাসল, বলল—সেদিনের কথা মনে হলে আমার সমস্ত শরীর দিয়ে শিহরণ বয়ে যায় । ওরকম সুখ আমি আর কখনো পেলুম না ।

শুনে একটু লজ্জা পেলুম । কখনো মানে ভিনি আজকের কথাও বলছে কি ? কে জানে মনে সন্দেহ এল আমাকে কিশোর বয়সে যতটা ভাল লেগেছিল ভিনির ততটা আজও লাগে কি না । কিংবা হয়ত আজও ভিনি সেই কৈশোরের ভালবাসাই বহন করে চলেছে । কি জানি !

ভিনির দুই চোখ নিঃশব্দে কথা বলছিল—আমি তোমাকে ভালবাসি সুমন । আমি তোমাকে ভালবাসি ।

ভিনি বড় সুন্দর । বড় ভালবাসে । আমার বৃকের ভিতরে লাফিয়ে উঠল একটি বল । চোখে অকারণ জল আসছিল । মনে মনে বললুম ভিনি সত্যি ? তিন সত্যি ? দিবা ? আমার গা ছঁয়ে বলো । দেখ ভিনি আমি কিছুই না । আমি কেবলমাত্র সুমন । তাও এ নাম জানে মাত্র কয়েকজন লোক । তুমি এই নাম বৃকে করে রেখেছিলে এতকাল ? কেন গো ? তিনটে চিঠি দিয়ে তুমি ডেকেছিলে আমার—কি সত্যি ? সত্যি বটে তোমার খেলামাটির রান্নাঘরে মাঝে মাঝে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, পাথরকুঁচি পাতার লুঁচি আর কাদামাটির তরকারী আমি জিভ আর ঠোঁটের কৌশলে চক্-চক্ শব্দ করে নকল খাওয়ানি খেয়েছি, সত্যি বটে তোমাকে আমি দেখিয়েছিলুম দু হাত তুলে বান্দরনাচ কিংবা চোখের পাতা উল্টে ভয় দেখানোর খেলা । কিন্তু তারপর ক্রমে আমি তোমাকে ভুলেও গিয়েছিলুম । পনেরো ষোলো বছর পরের এই তোমাকে আমি চিনিই না । ভিনি, মা-কালীর দিবা, সত্যি বলো । তিন সত্যি । আমার গা ছঁয়ে বলো ।

ভিনি চলে গেলে রাতে আমার ঘুম এল না । আমার শরীরের ভিতরে একটিমাগ্ন যন্ত্রণার মাহ একা খেলা করে ফিরছে । কখনো পেটে, কখনো বৃকে, কখনো মাথায় । ঠিক কোথায় যে তা বৃঝতে পারি না । ঐ মাহ আমার সমস্ত শরীরে এবং চেতনার একটি মাগ্ন কথাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে—সুমন, তোমার জীবন বড় একার হবে ।

আমি জানি । আমি ত্রা জানি । অন্ধকারে আমি আপনমনে মাথা নাড়লুম । তারপর চুপি চুপি আমার বালিশের কাছে বলে রাখলুম একটি নাম । ভিনি । ভিনি । ভিনি ।

ছেলেবেলায় চেনা কিশোরীদের মুখগুলি আর মনে পড়ে না । কত নাম ভুলে গেছি । তবু মৃত্যু নামে একটি মেয়ের সঙ্গে যে একটি দৃষ্টি দৃপ্তর আমি কাটিয়েছিলুম আমার কৈশোরে, তা মৃত্যু পর্যন্ত মনে থাকবে । আধো-অন্ধকার

ছাদের সিঁড়িতে আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম এক দুপুরে। ছাদের ওপর ঝড়ের মতো হাওয়ায় মড়্ মড়্ করে নুয়ে পড়ছে এরিয়ালের বাঁশ, কলতলায় এঁটো বাসনের ওপর কাকদের হুড়োহুড়ি, নীচের ঘরে শীতলপাটিতে শূয়ে ভাতঘুমে মা. আর তখন আমার বুক কেঁপে উঠেছিল, আমরা কথা বলছিলাম না. মিতু খুব আস্তে আস্তে আমার আরো কাছ ঘেঁসে আসছিল। অনেক কাছে চলে এল মিতু তার মুখ আমার মুখকে ছোঁয়-ছোঁয়। আমি সরে সরে রেলিঙের সঙ্গে সোঁটে গেছি, আমার বুক কাঁপছে, বুকের ভিতরে আমার সেই গলার স্বর - পালা সুমন. রেলিঙ টপকে দেয়াল ডিঙিয়ে পালিয়ে যা, অনেক দূরে চলে যা। আমি টের পেয়েছিলাম তখন দেয়াল কেঁপে উঠেছিল, কথা বলে উঠেছিল সিঁড়ি, মার মার শব্দে ছুটে আসছিল বাতাস। মিতু টেরও পারিনি। মিতু বলেছিল—তোর মুখে কেমন ভাত খাওয়ার গন্ধ! রোজ খাওয়ার পর লুকিয়ে পান খাবি, কিংবা মোরী, তারপর ফিক করে হেসে সে বলল—আমার মুখে একটা লবঙ্গ আছে, খাবি? দাঁতে টিপে সে লবঙ্গর একটি কণা আমাকে দেখাল, বলল—নে তোর দাঁত দিয়ে কেটে নে। নে না! বলে সে আমাকে টেনে নিল। সেই সময়ে, সেই নিতান্ত কৈশোরেও আমার মনে হয়েছিল আমি এক চারা গাছ. মিতু শিকড়সুন্দ আমাকে উপড়ে ফেলল।

আমাদের একটা ছোট্ট পুরনো জিনিসপত্র রাখার জন্য ঘর ছিল। সেই ঘরে ছিল সবুজ রঙের একটা তোরঙ্গ। আমি আর মিতু সেই তোরঙ্গ এক দুপুরে খুলেছিলাম। তাতে ছিল বাণ্ডিল বাণ্ডিল পুরনো চিঠি—সেগুলো সবই আমার বাবার লেখা মাকে, কিংবা মার লেখা বাবাকে। আমি আর মিতু পাশাপাশি বসে সারা দুপুর পড়েছিলাম সেই সব চিঠি। তারপর আমরা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে হেসেছিলাম। সবজান্তা হাসি। কিন্তু মা-বাবার ওপর অকারণে আমার বড় রাগ হয়েছিল। ইচ্ছে হয়েছিল আমি ওদের আর ভালবাসবো না। মিতু বলল,—তুই আমাকে চিঠি লিখবি? লেখ না। বানান ভুল করিস না. আর চিঠির ওপর ঠাকুর-দেবতার নাম লিখিস না। লিখবি তো? আমি বিকেলে এসে নিয়ে বাবো! তারপর তাকেও দেবো চিঠি!

সেই ঘটনার পর থেকে অনেক দিন আমি আমার বাবা-মার ওপর খুশী ছিলাম না। আমি বাগানে ঘুরে গাছের জিজ্ঞেস করতুম, আমি ঘরের দওয়ালকে জিজ্ঞেস করতুম. রাতে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে বুকজোড়া অন্ধকারকে জিজ্ঞেস করতুম. কেন আমি তাদের আর ভালবাসবো না?

মনে মনে আমি নিজেকে ডেকে বলেছিলাম—সুমন তুই কখনো বিয়ে করিস না।

আমাদের বাড়িতে প্রায়ই জ্যোতিষেরা আসতো। তাদের মধ্যে একজন একবার বাবাকে বলেছিল—সুমনের বৌ যেন খুব সুন্দর হয়। কখনো কুচ্ছিত কিংবা চলনসই মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবেন না। সেইতে পারবে না।

সেই জ্যোতিষী কী বলতে চেয়েছিল তা বন্ধুতে পেরে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠেছিল আমার ভিতরে অন্যকে ভালবাসার ক্ষমতা কত কম ! শিশুর মতো রঙীন খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে না রাখলে আমি সহজেই সব কিছুকে অবহেলা করবো ।

॥ চার ॥

মাঘ মাসের এক গোধূলী লগ্নে ভিনির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল ।
সনারোহে কিছুই হল না । খুব আলো জ্বলল না, বাজনা বাজল না : প্রায়
স্বপ্নতার ভিতরে আমি মনোচ্চারণ করলুম ।

বাসর ঘরেও আমরা ছিলুম একা । ভিনি চুপি চুপি আমাকে বলল—
বান্ধাঃ বাঁটা গেল ।

কেন ? আমি জিজ্ঞেস করলুম ।

ভিনি পরম নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধে বলল—কি জানি ভয় হচ্ছিল শূভদর্শিত্বের
সময়ে হয়ত দেখব অন্য লোক । তাহলে আমি ঠিক অজ্ঞান হয়ে পিঁড়ি থেকে
পড়ে যেতুম ।

হাসলুম—এত ভয় !

চোখ বন্ধে ভিনি একটা হাত বাড়িয়ে আমার বৃকে রাখল, বলল—মন,
তোমার বৃকের ভিতরে পালিয়ে যাওয়ার শব্দ । বলেই হাসল ভিনি, তেমনি
চোখ বন্ধে থেকে বলল—সেই কবে থেকে তোমাকে ভালবেসে আসছি মন, ভয়
ছিল যদি পালিয়ে যাও ! জানো না ত তোমার জন্য মা-বাবার সঙ্গে কত
ঝগড়া করলুম আমি !

আমার মাথার ভিতর গুনগুন করে ঘুরে বেড়াতে লাগল ভিনির ঐ কথাটুকু—
কি জানি, ভয় হচ্ছিল শূভদর্শিত্বের সময় হয়ত দেখব অন্য লোক ।

আমি আস্তে আস্তে ভিনিকে বললুম—ভিনি একটা কথা বলি ?

—হঁঃ ।

—ছেলেবেলায় আমার মাকে কখন ভাল লাগত জানো ? যখন রান্নাবান্না
আর কাজ করতে করতে মার চুল এলোমেলো হয়ে যেত, মুখে জ্বাবজ্বাব করত
ঘাম, সিঁদুর গলে নেমে আসত নাকের ওপর, যখন মার আটপোরে শাড়িতে
হলুদের দাগ, তখন মাকে আমি সবচেয়ে ভালবাসতুম । আর মা সাজগোজ
করত, গায়ে পরত ফরসা জামাকাপড়, তখন মাকে বড় গম্ভীর আর রাগী
দেখাতো যেন ছুঁতে গেলেই বকে দেবে । কিংবা মা যখন দুখে পেত, চুপ করে
বসে থাকত, অথবা হয়তো কোনো কারণে কাঁদত তখনই মা আমার সবচেয়ে
প্রিয় ছিল, আমি কেবল তখন মার আশেপাশে ঘুর ঘুর করতুম । কেন বলো তো ?

—কেন ?

—আসলে একটু কণ্ট, একটু দৃঃখের মধ্যেই মানুষকে দেখতে বোধ হয় আমার ভাল লাগে।

—পাগল। বলে ভিনি হাসল।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললুম—আমার বাবাকে আমি সবচেয়ে বেশী করে ভালবেসেছিলাম জানো ?

কবে ?

—মফঃস্বলে রেল-কলোনির এক ক্রিকেট-মাঠে একাট লোক ছাব্বিশ রান করে আউট হয়ে গেল। বড়ো স্কেয়ারের পাশে মাঠের ঘাসে বসে আমি দেখ-লুম সাদা পোষাক পরা লম্বা চেহারার যুবকটি ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, মাথা অঙ্গ নোয়ানো, হাতের ব্যাটটা শুনো একবার আধপাক ঘুরে গেল হতাশায়। মাথার টুপিটা খুলে নিয়ে স্লান হাসি মুখে বাবা প্রকাশ্যে মাঠটা আস্তে আস্তে পার হয়ে প্যাভিলিয়নের তাঁবুব দিকে চলে যাচ্ছিল। সে জানত না যে সেই সময়ে মাঠের দর্শকদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী দৃঃখ পাচ্ছিল তার জন্য, সে আমি। বাবা আউট হয়ে গেল বলে না, আসলে বাবার ঐ হেঁটে ফিরে আসা, আধপাক ঘুরে যাওয়া ব্যাটটার হতাশা আর মুখের হাসিটুকুর জন্য আমি কেঁদেছিলাম। তারপর থেকে বাবাকে যে আমি কি ভীষণ ভালবাসি ভিনি। এখনো যে বাবাকে ভালবাসি তার কারণ বোধ হয় ঐ মৃহৃতটি, বাবার আউট হরে ফিরে আসার ঐ মৃহৃতটি। বাবা বলে ভাবতেই ঐ দৃশ্য আজও আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। কেন বলো তো !

কেন ?

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম আসলে দু' একটিই ভালবাসার মৃহৃত থাকে আমাদের। না ? বলেই হাসলুম—ছেলেবেলায় তুমি মাত্র এক-বারই ভালবেসেছিলে আমায়।

শুনো ভিনি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আমি জানি তুমি আমাকে তেমন ভালবাসো না মন ! তেমন মৃহৃত তোমার কখনো আসেনি।

শুনো বড় চমকে উঠলাম। হেসে বললুম পাগলী !

ও চুপ করে আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল—তাতে কিছু আসে যায় না। আমি তো তোমাকে ভালবাসি !

আমি হেসে গলা নামিয়ে বললুম—ভিনি তোমার গায়ের জন্ম দাগটা কোথায় ?

অবাক হসে ভিনি বলল—‘কেন ?’

বললুম—তোমার গায়ের খোলা জামাগার দাগটা খুঁজে পাইনি।

একটু চুপ থেকে ভিনি হঠাৎ লাল হসে মুখ ফিরিয়ে নিল—এঃ মাগো, বিছদু কোথাকার...তোমার...তোমারটা কোথায় ?

তারপর অনেক রাতে ভিনি আমাকে তার জন্মদাগ দেখতে দিয়োঁছিল।

তিন বছরে আমাদের দুটি ছেলেমেয়ে হল। আর আমরা অল্প একটু বড়ো হয়ে গেলুম।

মাঝে মাঝে আমি ভিনিকে বলি—ভিনি, আমার মন ভাল নেই।

—কেন।

—কি জানি!

—শরীর খারাপ নয়? বলতে বলতে সে এসে আমার কপালে তার গাল ছোঁয়ায়, বদকে হাত দিয়ে দেখে গা গরম কিনা।

—না, শরীর খারাপ নয়। আমি বলি।

—রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলে?

—না।

—তবে কি?

—কি জানি। আমি বলি—মন ভাল নেই।

ভিনি হাসে—পাগল কোথাকার।

—আমার বড় একা লাগছে ভিনি।

ভিনি চমকে উঠে—কেন আমরা তো আছি।

আমি শূন্য চোখে চেয়ে থাকি। কথার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করি। পকেটে খাঁজ সিগারেট আর দেশলাই।

গত আশ্বিনে আমি আমার চৌত্রিশের জন্মদিন পার হয়ে এলুম। আমি জানি আমি খুব দীর্ঘজীবী হবো—আমার কুষ্ঠীতে সেই কথা লেখা আছে। ত্রিশের ঘরে বসে আমি তাই সামনের দীর্ঘ জীবনের দিকে চেয়ে অলস ও ধীর স্থির হয়ে আছি। বিছানায় শুয়ে হাত বাড়ালেই যেমন টেবিলের ওপর সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, জলের গ্লাস কিংবা ঘড়ি ছোঁয়া যায়, মৃত্যু আমার কাছে ততটা সহজে ছোঁয়ার নয়। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না রাতে আমার ঘরের জানালা খুলে চুপ করে বসে থাকি। হালকা বিশুদ্ধ চাঁদের আলো আমার কোলে পড়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে আমার রক্তের মধ্যে ডানা নেড়ে জেগে ওঠে একটি মাছ—ছোট্ট আঙুলের মতো একটি মাছ—শরীর ও চেতনা জুড়ে তার অবিরল খেলা শুরু হয়। আমার চেতনার মধ্যে জেগে ওঠে একটি বোধ, আমারই ভিতর থেকে কে যেন বড় মৃদু এবং মারার স্বরে ডাক দেয়, 'সুমন, আমার সুমন!' অকারণে চোখের জলে চোখ ভেসে যায়। আশ্তে আশ্তে জানালার চৌকাঠের ওপর মাথা নামিয়ে রাখি। মায়ের হাতের মতো মৃদু বাতাস আমার মাথা থেকে পিঠ পর্যন্ত স্পর্শ করে যায়। তখন মনে পড়ে—সুমন, তোমার জীবন খুব একার হবে।

দৈত্যের বাগানে শিশু

যৌবনকালটা লালুর কেটেছে মামদোবাজিতে । মামদোভূতের ধড় আছে, মড়ো নেই । লালুরও ছিল না । ধড় ছিল । সেটা দশাসই । ছেলেবেলা থেকেই তার চেহারাখানা বিশাল, দুখানা বিপুল কাঁধের মধ্যে আর মৃদুটা নিতান্তই ছোট দেখতে । দুখানা ভাল নয়, কিন্তু সেই মৃদু খুব সরলতা ছিল । ছিল নিষ্ঠুরতাও । মাথায় বৃন্দী ছিল না । পনেরো বোল বছর বয়সেও ক্রাস এইট-এর ছাত্র সে, তখন মদ খেতে শিখেছিল, খেলত জুয়া । পাড়ার লোক সেই বয়সের লালুকে অল্প স্বল্প ভয় করতে শুরুর করেছিল ।

বাজারের মধ্যে স্টোভ সারাইয়ের দোকান করত হীরেন । রাতে দোকানের বাঁপ ফেলে ভিতরে জুয়ার বোর্ড বসাতো । লালু ছিল সেই বোর্ডের মেষার । পাড়ার এবং এলাকার বিখ্যাত গুণ্ডা ছিল ননী । ননীর মার ছিল দেখার মতো । টাঙ্কিওলাদের লুট করত, পার্ক স্ট্রীট, এসপ্লানেডের বিখ্যাত বার থেকে মাতালদের ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যেত ময়দানে—পরনের অন্তর্ভাস ছাড়া সব কেড়ে নিত, পকেটমারদের কাছ থেকে নিত কমিশন । ননী জীবনে টাকাটা খুব চিনেছিল । মাঝে মধ্যে সে হীরেনের দোকানের জুয়ার বোর্ডটা লুট করত । খুব টাকার দরকার হলেই এটা করত সে । হীরেনরা বরাবর ননী গুণ্ডাকে দেখলেই বোর্ড ছেড়ে দিত ।

একদিন লালু থাকতে না পেয়ে বলল—রোজ রোজ বোর্ডটা ভেঙে দিয়ে যাও ননীদা, আমরা বড়টখামেলা কিছুর করি না—কিন্তু কাজটা কি পুরুষের মতো হচ্ছে ?

ননী একপলক তাকে দেখে বলল—শরীর বানিয়েছিস, না রে শালা ? কিন্তু তুই খারাপ হয়ে যাবি লালু ।

লালু ভয় খেয়ে বলল—কিন্তু আমরা তো তোমাকে কিছুর বলি না কখনো । খেলাটা ভেঙে গেলে রোজ ভাল লাগে না, তাই—

ননী কেবল ঠাণ্ডা গলার আবার বলল—তুই খারাপ হয়ে যাবি লালু । বিলা হয়ে যাবি—

টাকা পরস্যা তুলে নিয়ে ননী হাত বাড়িয়ে লালুর কাঁধের জামাটা ধরে বলল—আয় ।

ননী ডাকলে বেশীর ভাগ লোকই প্রতিশোধের কথা ভুলে সম্মোহিতের মতো তার সঙ্গে যায় । অত বড় শরীর নিয়ে লালুও তার অর্ধেক মাপের ননীর সঙ্গে উঠল ।

বাজারের পিছন দিকে একটা চাতাল, মফঃস্বলের মেয়ে আর শিশুরা এখানে আনাজ নিয়ে বসে। রাতে জায়গাটা ভারী নির্জন, সুন্দর। অদূরে একটা পাঁচমাদের ঝোপড়া আছে, তাতে ঝাঁকামুটে মজুরদের বাস। কিন্তু তারাও নির্জনতারই অংশবিশেষ। ননীকে দেখলে তারা পাথর হয়ে যায়।

খুব জ্যোৎস্না সেদিন। সেই জ্যোৎস্নার চাতালে এনে লালুকে দাঁড় করিয়ে ননী ঠাণ্ডা গলায় বলল—যদি বিশ্বাস থাকে তো ভগবানের নাম নে শ্রুয়োরের বাচ্চা।

এতক্ষণ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। ননী বেড়াল-ইঁদুরের খেলাটা ঠিকই খেলতে পারত। ভয়ে নেংটি ইঁদুরের মতোই কাঁপছিল লালু। কিন্তু ননী ভুল করল গালটা দিয়ে।

লালুর বাপ নিরীহ মানুষ ছিলেন। কাজ করতেন সরকারী অফিসে। কেরানী। ছোটোখাটো মানুষ। ছেলে-বউয়ের ওপর কোন কতৃৎ ছিল না। লালু যখন বড় হতে হতে বিশাল চেহারা বিশিষ্ট হয়ে উঠল, ছেলের বাড়ি দেখে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর ছেলে এরকম বিরাট আকৃতির হয় কী করে তা তিনি খুব ভাবতেন। মাঝেমধ্যে স্ত্রীকে তাঁর সন্দেহ হত। তিনি বলতেন,

—এ ছেলে আমার না নিশ্চরই।

লালুর মা ভারী অবাধ হয়ে বলতেন—তবে কার ?

আমতা আমতা করে লালুর বাবা বলতেন—হাসপাতালে অদল বদল হয়নি তো। মনে হয় আমার বাচ্চা নিয়ে অন্য কেউ তার বিকট ছেলেটা পাচার করে গেছে।

এরকম অলক্ষ্যে কথা শুনে লালুর মা ভীষণ চেষ্টামেচি শুরুর করতেন। পাড়ায় জানাজানি হত। লোকে হাসত। পাড়ার বউ-ঝিরা তাদের দৃষ্টির কুটকচালির আসরে লালুর মায়ের চরিত্র বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করত—ওটুকু মানুষের ওরকম দানবের মতো ছেলে হয় কখনো ?

সেসব কথা লালুরও কানে আসত। সে স্পষ্টই বুঝতে পারত যে তার বাপ তাকে একটুও পছন্দ করে না। উপরন্তু তার জন্ম এবং পিতৃপরিচয় বিষয়ে নানা লোকের নানা সন্দেহ। কিন্তু কেন যেন নিজের বাপ এবং মার প্রতি লালুর একটা পাগলাটে ভালবাসা ছিল। সে তার রোগা খিটখিটে সন্দেহপ্রবণ বাপকে ভালবাসত খুব। মাঝে মধ্যে বাবা অফিস থেকে ফিরলে সে গিয়ে সম্ভোবেলা তার দানবীয় হাতে বাপের গা হাত টিপে দিতে দিতে বলত, আমি তোমার ভাল ছেলে, না বাবা ?

বাপ সত্যক হয়ে ক্ষীণ গলায় বলত—আরো ভাল হ লালু। তাকে দেখে ভয় লাগে আমার।

—ভয় কি বাবা। আমি ঠিক আছি।

লালদুর বাবা ক্ষীণ গলায় বলতেন—অত জোরে দাবাস না—লাগে। চরিঘটা একটু ঠিক রাখিস। বেড়ে উঠলেই হল না, বাড়ের সঙ্গে আবার সংঘম চাই।

লালদু সে সব বদ্ব্যত না। তার শরীর সব সময়ে ছটফট করে—সে করবে কী? কাজেই সে বাবার কথায় আমল দিত না, কিন্তু লোকটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত।

কাজেই জ্যোৎস্না রাতে বাজারের পিছনের নির্জন চাতালে যখন তাকে মারবার আগে ‘শুয়োরের বাচ্চা’ বলে গাল দিল ননী তখনই একটা মারাত্মক ভুল করল। ঐ গালাগালে হঠাৎ নিজের নিরীহ ছোটখাটো বাবার চেহারাটা লালদুর মনে পড়ল। পলকে গরম হয়ে গেল গা। সরে গেল সমস্ত জড়তা। সে ঘুরে তার হোঁতকা হাতে বুলেটের মতো একখানা ঘর্ষি ঝাড়ল ননীর মূখে।

তৈরি থাকলে এসব ঘর্ষি ননী সহজেই এড়াতে পারে। কিন্তু লালদু সম্পর্কে সত্যক হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। হোঁতকাটা ভয়ে কাঁপছে দেখে নিশ্চিন্ত মনে ননী একতরফা মারের জন্য তৈরি হিচ্ছিল। আচমকা ঘর্ষিটা লাগল সেই সময়ে। একটা কোলবালিশের মধ্যে চাতালে পড়ে গেল ননী।

বাপ তুলে গালাগাল। অ্যা? বাপ তুলে? বিড়বিড় করে বলতে বলতে লালদু ননীর লাশ টেনে তুলল এক হাতে, অন্য হাতে মোটরগাড়ির পিস্টনের মতো চালাতে লাগল। কোঁক কোঁক করে কয়েকটা শব্দ করল ননী, তারপর চুপ হয়ে গেল। কিন্তু লালদুর রাগ তখনো শেষ হয়নি। সে দুহাতে ননীর গলা টিপে ধরে বলছে তখনো—আর বলবি? আর বলবি কখনো?

লালদু তখনো জানত না, তার হাতের চাপে ননীর গলার মেরুদণ্ডের দুটো হাড় ভেঙে গেছে, জিভ বেরিয়ে ঝুলছে এবং অনেকক্ষণ ননী শ্বাস নিচ্ছে না।

বাজারের বন্ধ দোকানঘরের আড়াল আবড়াল থেকে দৃশ্যটা দেখে হীরেন আর তার দলবল এসে জাম্বু লালদু আর ননীকে আলাদা করল। হীরেনরা খুব খুশী। কিন্তু লালদুর বিপদ বদ্ব্য বলল—তুই পালা। বাড়িতে গিয়ে শূয়ে থাক, কোথাও বেরোসনি। আবড়াল দিয়ে বাড়িতে ঢুকবি, পাড়ার লোকে যেন দেখতে না পায়।

লালদুর ভয় ঢুকল আবার। নেংটি ইঁদুরের মতো পালাল সে। ঘরে শূয়ে শুনল, পুঁলিশভ্যান আসছে যাচ্ছে। একটু রাতে বাজারের দিকটার ননীর দলবল হুজুত শূরু করল। ঘরে শূয়ে কাঁপতে লাগল লালদু।

কিন্তু ননী মরেই গেছে। কোনো ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে আর ফিরবে না। তার দলবলও খুব এককাটা ছিল না। দু চারদিন হামলা হল, খোঁজা খঁজিও হল, কিন্তু লালদুর গায়ে হাত পড়ল না। বাজারের হীরেন আর তার দলবল লালদুকে আড়াল দিল কিছুটা। জুয়ার বোর্ডটা নিরাপদ করেছে লালদু, কাজেই তার জন্য কিছু করতেই হয়।

লালদু আবার রাস্তায় বেরোয়, হীরেনের আঙায় গিয়ে বসে, চোলাই খায়! তখন তার বিশ বছর বয়স।

পটাকে দেখে এখন আর বুদ্ধবার উপায়ও নেই যে সে এক সময়ে কে বা কী ছিল। কিন্তু লোকে তখনো বলে—পটা মাস্তানের মতো অমন ওস্তাদ আর হয় না। কিন্তু কোন এক লীলারানীর কাছে যা খেয়ে পটা সব ছেড়ে সম্রাসী হয়ে যায় কিছুদিন। লাইনের ওপারে ছোট্ট কালী মন্দির বানিষে রক্তবর্ণ পোশাক পরে পটা কিছুদিন খুব সাধনভজন করে। সামাজিক দৃষ্টকর্ম সবই ছেড়ে দেয়। পটার দাপটে যারা ম্লান হয়ে ছিল এতদিন—এই ফাঁকে তারা উন্নতি করে ফেলল। পটা কালীসাধনা করতে করতে আড়চোখে দেখল সবই। কালীর মূখের ওপর লীলারানীর মূখটা মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে। পটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করে থাকে। মনটা খুব ছটফট করলে মাঠ থেকে যার তার পাঠা ধরে এনে বলি দেয়। এইরকমভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছিল পটা। এখন বয়স হয়ে গেছে। কালীমন্দিরটা নিয়ে পড়ে আছে সে। তবু একটা চোখ তার সব সময়েই খোলা, পাড়ার দিকে নজর রাখে। কোন মাস্তান উঠছে, কেউ বা পড়তির দিকে। এটা তার অভ্যাস, ছাড়তে পারে না।

ননী মরে গেলে সে একদিন লাইন পেরিয়ে পাড়ার ঢুকল।

লালুর আত্মবিশ্বাস এখন অনেক বেড়ে গেছে। তার শরীরটা হোঁতবা হলেও যে কাজের তা সে বুদ্ধিতে পারে আজকাল। মারপিট হুজুতে লাগলে সে সবার আগে যায়। লোকে তাকে রাস্তা ছেড়ে দেয়।

মোড়ের মাথায় পটা ধরল লালুকে।

—শোন।

লালু একটু চোখ কুঁচকে পটাকে দেখে। খুব একটা আমল দিতে চায় না। কিছু পটার রক্তবর্ণ পোশাক, উড়োউড়ো চুল দাড়ি, রোগা শূকনো চেহারার মধ্যে এখনো একটা কিছু আছে যাকে ঠিক উপেক্ষা করা চলে না। তাই লালু পটাকে আমল দেবে না করেও কাছে গিয়ে বলল—কিছু বলছ পটাদা?

বলছি। গায়ে অত মাংস কেন তোব? ভারী শরীর নিয়ে কিছু করা যায় না বুদ্ধালি?

বাস্কের হাসি হাসে লালু, বলে—করা যায় না কি করে বুদ্ধছো?

পটা আধখোলা চোখে একটু চেয়ে থেকে বলে—ননী কে সাফ করেছিল বলে বলিছিস। ননী তৈরি থাকলে তোর মতো চারজনকে জমি নেওয়াতো। আলটপকা মেরেছিস। তা সব সময়ে কি সেরকম হবে?

বলে রোগা হাতখানা বাড়িয়ে পটা বলল—এই হাতখানা ধরে দেখ, বুদ্ধতে পারবি।

লালু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার প্রচণ্ড হাতখানা বাড়াল। পটা তার রোগা আঙুল দিয়ে লালুর পাঞ্জাটা ধরে আলতো চাপে মোচড় দিল একটু। বাথায় থরথর করে কেঁপে উঠল লালু। হাতখানা বুদ্ধি কবাজি থেকে ভেঙেই যায়।

—আহা, ছাড়ো ছাড়ো—

পটা মৃদু হাসে। ছেড়ে দিয়ে বলে—তাই বলছিলাম কি গায়ের মাংস আর একটু বরিয়ে দে। কারণ নিজের মাংস নিজের শত্রু। লাইনের ওপারে মায়ের মন্দির আছে আমার জানিস তো! সেখানে বিকেল বিকেল চলে আসবি। তোকে তৈরি করে দেবো।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে রোগা শূকনো চেহারার পটাকে কয়েক পলক দেখে লালু। সে দেবী দন্তর আখড়ায় বিস্তর মাটি মেখেছে, যন্ত্রপাতি নেড়ে তৈরি রেখেছে শরীর তবু এই রোগা দুর্বল পটার হাতের ক্ষমতার কাছে সে ছেলেমানুষ। ওস্তাদ একেই বলে!

পটা হাসল, আবার লালুর মুখ দেখে বলল—ননী চিরকালের গোঁয়ার, তার ওপর পরসার লালচ। ওসব লালচ থাকলে মানুষ অন্ধ। নইলে তোর মতো আনাড়ির হাতে যার?

লালু বদ্বল যে সে এখনো আনাড়ি। মাস্তানার বিষয়টি এখনো বিস্তর শিখবার আছে। তাই সে বিকেল বিকেল লাইন পেরিয়ে পটার মায়ের মন্দির যেতে লাগল।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন পটা কেবল নিজের ডানহাতটা মৃদু করে বাড়িয়ে দিয়ে বলত—মৃদু ঠোঁট খোল।

পটার হাতের সেই মৃদু ঠোঁট খুলতে সারা বিকেল প্রাণপণ চেষ্টা করে থেমে যেতো লালু। পারত না। বলত—কী দিয়ে তৈরি গো তোমার হাত পটাদা?

পটা হাসে, বলে—আজ যা, কাল আবার আসিস।

লালু সেলাম করে ফিরত। কিন্তু যাতায়াত বজায় রাখল সে। পটা শেখাত। বলত—এসব কাউকে শেখাইনি বড় একটা। এখন বড়ো হয়ে যাচ্ছি, আমার সঙ্গেই সব চলে যাবে, তাই ভাবছি, তোকে দিয়ে যাই। কিন্তু দেখিস বাপু, লালচ বেশী করবি না, কখনো কোনো মেয়েমানুষের কেস নিবি না, গুরুকে মনে রাখবি।

লালু মাথা নাড়ে।

তারপর একদিন লালু মায়ের বাড়িতে পূজো দিয়ে বেরিয়ে এল। ভারী খুশী সে।

বিশাল শরীর এবং যথেষ্ট হিংস্রতা নিয়ে লালু ঘুরে বেড়াতে লাগল। শরীরের মাংস অনেকটা ঝরে গিয়ে শরীরটা হালকা লাগে এখন। চলন্ত মালগাড়ীর গা বাইতে পারে, টপকাতে পারে উঁচু দেওয়াল। সবচেয়ে বড় কথা এখন আর টপ করে ভয় পায় না আগের মতো। পটা তাকে শিখিয়েছে, যখন হাঁটবি চলবি তখন চোখের মণি নড়বে ঠিক যেন দেওয়াল ঘাড়ের পেন্ডুলাম। হাঁ করে এক দিকে চেয়ে হাঁটবি না। চারদিক নজরে রাখবি। তাই রাখে লালু। দুখানা চোখ টক টক করে ডাইনে বাঁয়ে নড়ে, তার, সর্বাঙ্গ নজরে রাখে। এখন তার জীবন বিপজ্জনক।

ওয়াগন-ভাঙিয়ে হিসেবে লালু বেশ নাম করল। হাইওয়েতে মাঝে মাঝে লরী বা মোটর গাড়িও থামায় সে। পাড়ার বেশীর ভাগ দোকানদার তাকে খাজনা দেয়। রোজগারপাতি মন্দ না।

কিন্তু বিপদও আছে। ওয়াগন ভাঙাদের পুরনো দলটার সঙ্গে বিস্তর বোম্বাবাজি চলল কিছুদিন। পুরনো দলটা ভেঙে যাচ্ছিল, লালুর দলটা তৈরি হচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল, দিনে কালে লালুর দলটাই দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু বিনা হুদ্দজতে নয়।

ঠিক দুপুরবেলা লালু পেটোপাড়ার ভিতর দিয়ে আসছিল। সেই সময়ে হঠাৎ সে দেখল কে যেন সুইচ টিপে সূঁচটা নিবিয়ে দিল। এমন কি সুইচ টেপার ফুটস একটু আওজাজও শুনতে পেল সে। অন্ধকারে মূখ থুবড়ে পড়ল রাস্তায়। তার গলায় সোনার চেনে বাঁধা বাঘনখ বেয়ে রক্ত পড়ছিল টপ্ টপ্।

হাসপাতালে তাকে দেখতে এল পটা। মাথায় বিরাট ব্যান্ডেজ নিয়ে পড়ে আছে লালু। গুলিটা বের করেছে ডাক্তারেরা, কিন্তু তবু মাঝে মাঝেই মাথাটা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। সেই আলো-অঁধারির ভিতরে সে পটাকে দেখে ক্ষীণ গলায় প্রশ্ন করল—পটাদা আমি মাইরি শেষ হয়ে গেলুম।

পটা গম্ভীর মুখে বলে—তোরা একটা জিনিস নেই লালু। ওস্তাদ হতে গেলে সে জিনিসটা চাই-ই।

—কী সেটা।

—আর একটা ইন্দ্রিয়। আমি আগেই জানতাম, তোরা সেটা নেই।

—সেটা কী রকম জিনিস?

পটা একটু ভেবে উত্তর দিল—কী রকম যেন ঠিক বোঝানো যায় না। চোখ কান ছাড়া আর একটা জিনিস। আমার মাথায় ঠিক রুম্মালের মতো একটা জিনিস আছে। সেটা সব সময়ে এদিক-ওদিক ঝাপট মারছে। আমার চোখের আড়ালে কোথাও কি হচ্ছে না হচ্ছে তা ঝাপটা মেরে জানিয়ে দিচ্ছে আমাকে। কোন বাস্কা ঠাণ্ডা কোন রাস্তা গরম তা রাস্তা দেখেই আমি বলতে পারি। মানুষের চোখের দিকে চেয়েই বন্ধুতে পারি যে কোন লাইনের লোক। তোরা মনুষ্যবিল হচ্ছে তুই তা পারিস না। তোরা শরীর আছে, কারদাও জানিস, কিন্তু ও জিনিস তোরা নেই।

ভারী হতাশ হল লালু। বলল তা এখন আমি করব কী?

পটা বলল—তোরা জখমটা ভাল নয়। মাথার চোট সারাজীবন জ্বালায়। নিজের হাতে তৈরি করেছি তোকে, একটা ভাল মন্দ কিছু হলে বন্ধুকে লাগবে বড়। তার চেয়ে তুই লাইন ছেড়ে দে।

লালুর মাথা আবার অন্ধকার হয়ে গেল এই কথা শুনলে।

বুড়োবয়সে লালুর বাবা মায়ের একটি মেয়ে হয়েছিলেন। তার তখন পাঁচ

বছর বয়স। লালু তার এই রোগা টিঙটিঙে বোনটিকে ভাল করে লক্ষ্যও করেনি কোনোদিন। হাসপাতাল থেকে ফিরে যখন কিছুদিন ঘরেই শুয়ে বসে থাকতে হল তাকে, তখন ছোট বোনটি তার কাছে ঘুরঘুর করত। তার বিছানার কাছে বসে গুটি খেলত, পদ্মতুলের সংসার বসত খুলে। কখনো বা রান্নাবাটি খেলায় লালুকে নেমন্তন্ন করত। এইভাবেই মায়ী জন্মায়। লালু ঘরবন্দী বলেই আরো বেশী মায়ীটা জন্মায়। তখনো মাঝে মাঝে মাথা অন্ধকার হয়ে যায়, একটা দিক ফাঁকা ফাঁকা লাগে সব সময়ে। শরীরটা কাঁপে, নিজের জন্য ভারী একটা দৃষ্টি হয় তার। তখন সব ভুলবার জন্য বোনের সঙ্গে রাজ্যের খেলনা নিয়ে বসে লালু। আস্তে আস্তে নিজের কথা ভুলে যায়। নিজেকে শিশুর মতোই লাগে তার।

তার দলটা দাঁড়িয়েই গেল। ওয়ানগন ভাঙার এমন গুস্তাদ দল বড় একটা আসেনি। দলের ছেলেরা এসে লালুর হিস্যার অংশ বাড়িতে পেঁঁছে দিয়ে যায়, কিন্তু তারাও বদ্বন্ধে পারে, লালু শেষ হয়ে গেছে। বোনের সঙ্গে সারা দিন খেলে খেলে তার মুখ চোখও একটা শিশুর মতো হাব ভাব। তারা বদ্বন্ধে পারে, লালু আর লাইনে নামতে পারবে না।

সেটা লালুও বোঝে। বদ্বন্ধে একদিন সে তার হিস্যার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলল—আমি বসে গেছি রে। ও টাকা ছুঁতে আমার লজ্জা করে। তোরা ভাগজোখ করে নে।

তারা খুব একটা আপত্তি করল না। টাকা ফেরত নিল।

লালু একটা শ্বাস ফেলে বোনের সঙ্গে খেলায় ডুবে গেল আবার। সে এখন এক পায়ে লাফিয়ে একা দোকান খেলতে পারে। হাত চিত উদ্ভূত করে গুটি খেলতে পারে, পদ্মতুলকে পরাতে পারে কাপড়।

কিন্তু সেইসঙ্গে রোজগারও বন্ধ। সরকারী অফিসের টাকায় বাবা সংসার চালিয়ে নিচ্ছিল কোনোরকমে। কিন্তু রিটারায়মেন্টের সময় এসে গেল। লালুকে এখন আর তেমন ভয় করে না কেউ, বাবাও না। এবার বাবা ডেকে বলল—লালু, তোমার মতিগতি ভাল হয়েছে, খুব সুখের ব্যাপার। কিন্তু রোজগারপাতির বৃদ্ধি কই। শ্রদ্ধা ভালমানুষীতে তো চলবে না।

লালু বদ্বন্ধ। কিন্তু সে লেখাপড়া শেখেনি। পটা গুস্তাদের কাছে যা সে শিখেছে তা আর কাজে লাগাবার মতো ক্ষমতা তার নেই। তবু সে বোনের সঙ্গে খেলা ছেড়ে একটু-আধটু বেরোতে লাগল।

প্রথমেই গেল স্টেশনের গায়ের তাদের চায়ের দোকানটার, দলের ছেলেরা এখানেই বসে।

সন্ধ্যাবেলা। কয়েকজন বসে আছে। তাদের মধ্যে দুজন—নীলু আর শানু লালুর চেনা—বাকী কজন নতুন। নীলু আর শানু খাতির করে তাকে বসাল। নতুনরা তাকে গ্রাহ্য করল না। এক দুইবার দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল।

লালু নীলুকে বলল—আমার কিছু টাকার দরকার নীলু, দোকান করব।

নীলু মন দিয়ে শুনলে ভেবে বলল—ধার না হিসাব ?

লালু মাথা নাড়ে—ওসব না। কাজে নামব।

নীলু আবার ভাবে। অনেক ভেবে বলে—দল ঠিক আগের মতো নেই লালুদা। পদলিশেরও হুজুত খুব। নতুন ছেলেরা এসেছে—তারা কাউকে বিশ্বাস করে না। তুমি নামতে চাও ভাল, আমি সবারই সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। কাল একবার এসো।

লালু গেল পরদিনও। নতুন ছেলেরা তার হোঁতকা শরীরটা চেয়ে দেখল মাত্র। নীলু গম্ভীরমুখে আড়ালে ডেকে বলল—তোমাকে নেবো। কথা হয়েছে, কিন্তু এখন দল বেড়ে গেছে অনেক, আমাদের হিসাব বেশী থাকে না। পদলিসকে কত দিতে হয় তা তো তুমি জানই। আর একটা কথা, এখান থেকে কার্পিটাল বাগিয়ে সরে পড়বে তা হবে না। দলে থাকতে হবে। ভেবেচিন্তে এসো।

কথাটা লালু ভাবল অনেক। ওয়গনভাঙা কিছু শক্ত কাজ না। গাড়ি জায়গা মতো দাঁড়ায়, পদলিশও বন্দোবস্ত মতো তফাতে থাকে। কেবল বন্ধ ওয়গন খুলে মাল বের করা। কিন্তু ওই যে দল ওই দলটাই সাংঘাতিক। বহুকাল সে আঁ দল করেনি। এখন বুঝে চলা কি সম্ভব ! এবটু এদিক-ওঁদিক হলে লাশ পড়ে যাবে। পটাদা কী একটা হিন্দুর কথা বলত, যেটা তার নেই ! সেটা নোঁ ঠিকই। তাই একটু-আধটু ভয় করে লালুর। গলায় সোনার চেনে বাঁধা বাঘনখটা মুখে পুরে সে জুঁ কুঁচকে তাবে। ভাবলেও কিছু সমাধান পায় না। মাতার ভিতরটায় একধারে এখনো জমাট অন্ধকার। সব সমস্যা গিয়ে সেইখানে সের্ধোয়। ভারি অস্থির লাগে তার।

তবু নামে লালু। দাঁদিন তাকে কোনো কাজ দেওয়া হল না। দলের সঙ্গে থাকল কেবল। তিন-চারদিন পর গাড়ি থামতে দরজা খুলে অভ্যাস মতো উঠে গেল লালু। পা দিল গমের বস্তায়। হাতে হাতলওলা সরু হুড়ক। তার পিছনে উঠলো তিন চারজন নতুন ছেলে।

ওয়গনের ভিতর অন্ধকার। যার হাতে টর্চ সে কেন যেন টর্চটা জ্বালল না।

অন্ধকারেই বিপুল একটা বস্তা টেনে তুলল লালু ; পাকসাঁট মেরে দরজার কাছে ফেলল। নিচে থেকে কারো বস্তাটা ধরার কথা : লালু বস্তাটা বুলিয়ে ধরে রইল, নীচে থেকে কেউ তা ধরল না। কিছু বুঝবার আগেই ওয়গনের ভিতরের অন্ধকার থেকে হুড়ক-এর সরু অংশটা কে যেন সজোবে বসাল তার কাঁধে। বাথায় চোঁচিয়ে উঠল সে, হাতের বস্তাটা পড়ল প্রথমে, তার ওপর পড়ল সে, পিছন থেকে একটা লাথি খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে। ভারী শরীর তার, উঁচু ওয়গন থেকে পড়ে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে সে কাঁধ চেপে বোকার মতো চেয়ে রইল কেবল টলটলে রক্তে ভেসে যাচ্ছিলে তার হাত। ওয়গনের ভিতর থেকে একটা তীর টর্চের আলো এসে পড়ল তার মুখে ! একটা গলার স্বর

বলল—আমরা নতুন লোক পছন্দ করি না লালু। কেটে পড়ো।

লালু সে টেবের আলোর দিকে চেয়ে বলল—কিন্তু নীলু যে বলছিল।

—নীলুও যাবে। তুমি পুরনো লোক, দলটা তোমার হাতেই তৈরী—
আমরা জানি। তাই তোমাকে জান-এ মারলাম না। পুরনো লোক আমরা
পছন্দ করি না। কেটে পড়ো।

লালু তার অশ্বকার মাথা দিয়েও ব্যাপারটা বুঝল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—
কিন্তু আমার হিসাব ?

—যে গমের বস্তাটা নামিয়েছো ওটা নিয়ে যাও।

বস্তাটা অবশ্য নিল না লালু। কিন্তু ফিরে গেল। আস্তে আস্তে ইয়াড'পার হল। টপকাল রেলের লোহার বেড়া। অশ্বকারে গা ঢাকা দিয়ে ফিরে এল বাড়িতে।

পৰ্বদিন আবার শিশুর মতো মুখ নিয়ে ঘুম থেকে উঠল সে। খেলতে শুরুর করল ছোট বোনের সঙ্গে।

দিনসাতক বাদে খবর পেল, রেল কাটা পড়ে নীলু মারা গেছে। শূনে একটু শিউরে উঠল সে। ছোট বোন মিলু পাড়ার রাজের ছেলেমেয়ে জুটিয়ে আনে, তাদের নিয়ে সারাদিন খেলে লালু। নীলু মারা যাওয়ার খবর পেয়ে সে সেইদিন তাদের নিয়ে বাড়ির উঠানের করবী গাছের নীচে বনভোজন করল। বাচ্চাদের হুরোড়ে ডুবে রইল সারাদিন।

কিন্তু এবাবে চলে না।

দশুদের গাড়িটা গতবছর বেচে দিয়েছে। গ্যারেজটা খালি পড়ে আছে। লালুর খুব ইচ্ছে ওখানে একটা দোকান দেয়। মনোহারী দোকান। সামান্য কিছু খোক টাকা হলে চলে যার।

সে বাবার কাছে টাকাটা চাইল প্রথমে।

বাবা অবাধ হয়ে বললেন—আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ডাঙবো ? তোমার কি মাথা খারাপ। বড়ো বয়সে আমাদের খাওয়াবে কে ? তার ওপর তোমার বোনেরও বিয়ের জন্য কিছু রাখতে হবে। কেরানীর প্রভিডেন্ট ফান্ড তো বাপু রিজার্ভ ব্যাংক নয় ! সামান্য দশ পনেরো হাজার টাকা—

লালু বুঝল। বাবাকে সে এখনো ভালবাসে। যাদের সে ভালবাসে তাদের মুখ দেখতে তার ভাল লাগে না।

একদিন সন্ধ্যা পেরিয়ে শানু এসে হাজির। চুপি চুপি ডেকে নিয়ে বলল—লালুদা, কী করি বলো তো ?

—কেন, কী হয়েছে ?

—শোনোনি নীলু সাফ হয়েছে ?

—শুনেছি।

নতুন ছেলেরা আমাদের আর চাইছে না। নীলুকে রড মেরে লাইনে

ফেলে রেখে সরেছে। আমি পালিয়ে আছি।

লালু একটু ভাবল। বলল—শানু, আর তোতে আমাতে একটা মনোহারী দোকান দিই।

শানু হাসল—তিন পয়সার মাল কিনে পাঁচ পয়সায় বেচে দূর পয়সা লাভ? দূর, ওসব কি আমাদের পোষায়! অন্য কিছুর বল।

লালু কী বলবে ভেবে পেল না। কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছিল, শানুর মাথার চুলে পাক ধরেছে, জুঁলপি বেশ সাদা। যখন দাঁড়ায় তখন একটু কুঁজো দেখায় ওকে। শানুর বয়স বেশী, লালুর চেয়ে অনেক বড়, লালু ওস্তাদ ছিল বলে তাকে দাদা বলে ডাকে।

লালু মাথা নেড়ে বলল—লাইন আমার নয়। কিছুর টাকা পেলে আমি দোকান দেবো।

শানু বলে—টাকা পাচ্ছে কোথায়?

এই প্রশ্নটার উত্তর সহজে দিতে পারে না লালু। ভাবে।

শানু বলে—তুমি এখনো ওস্তাদ আছো। চলো, কিছুর ক্যাপিটাল জোগাড় করি। পেলে আমিও ব্যবসাতে নামবো, অর্ডার সাপ্রাইয়ের।

বলতে বলতে শানু তার কোমর থেকে একটা রিভলবার বার করে দেখিয়ে একটু চোখ টিপল।

রিভলবার বিস্তর দেখেছে লালু, নেড়েছেও অনেক। তবু এখন দেখে তার বুক কেঁপে উঠল। বলল—রেখে দে। মিলুটা দেখলে ভয় পাবে।

চোখের পলকে যন্ত্রটা লুকিয়ে শানু বলল—একটা কি দুটো কেস করব তার বেশী না। বিশ্বাস কর, ক্যাপিটাল হলেই কেটে পড়ব।

একটা শ্বাস ফেলে লালু বলল—তাই চল তবে!

নাগরমল ওয়াগন ভাঙিয়েদের পূরনো খদ্দের। তার গদিতে রাত বিরেতে মাল পৌঁছয়। সকাল হতে না হতে বড়-বাজারে তার পাইকারী আড়তে চলে আসে মাল। নগদ কারবার। স্টেশনের কাছাকাছি তাই তার একটা গদি আছে। সারাদিন ফাঁকা গদিতে একটা বাচ্চা ছেলে বসে মাছি তাড়ায়। ব্যবসা শুরুর হয় রাতে অনেক রাত পর্যন্ত গদিতে আলো জ্বলে, ভিতরে নড়াচড়া করে লোকজন। বাইরে অন্ধকারে বাতি নিবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দুই তিনটে লরী। ওয়াগন ভাঙিয়েদের দলে আছে বলে নাগরমলের তেমন ভয়ভর নেই। বাঁধা রেট-এর ব্যবসা, টাকা পয়সা নিয়েও বড় একটা গোলমাল হয় না। আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ গদিতে ক্যাশ পৌঁছে যায়। ক্যাশের জন্য দারোয়ানও থাকে না। এগারোটা বারোটার মধ্যে টাকা হাত বদল হয়ে যায়।

লালু আর শানু এক রাতে হানা দিল গদিতে। শানুর হাতে রিভলভার,

লালদুর হাতে রড। দৃজনেই মৃখে কালি মেখেছে, রুমালে বেঁধেছে মৃখ !
এতকাল পরে এই সব হৃজ্বত করতে লালদুর খুব ভয় করছিল বলে একটা দিশি
মদের পাইট ভেঙে খেয়েছে দৃজন।

নাগরমল একদম তৈরি ছিল না। লরীর ড্রাইভাররা এ সময়টা কাছে পিঠে
থাকে না, লরী ভিড়িয়ে মাল টানতে খাল ধারে যায়। গদীতে নাগরমল নিজে
আর দৃজন নিরীহ কর্মচারী। এ সময়ে বাঁপ ঠেলে দৃজন ঢুকল। নাগরমল
দৃশ্য দেখে হাঁ করে রইল।

রিভলভারটা নেড়ে শান্দু ক্যাশবাক্সটা দেখাল শৃধু, মৃখে কিছু বলল না।
নাগরমল হাঁ করে বাতাস গিলে ফেলল। তারপর লালদুর বৃকের সোনার চেন-এ
বাঁধা বাঘনখটা দেখল সে। লালদুর বিশাল চেহারাটার সঙ্গে বাঘনখটা মিলিয়ে
দেখতেই কয়েক বছর আগেকার লালদুকে মনে পড়ে গেল তার। বলল—আরে
রাম রাম লালদুবাবু, কী খবর? এ সব কী হচ্ছে? যাত্রাপার্টি নাকি।

লালদুর বৃকটা বড় চমকে ওঠে। চিনে ফেলেছে নাগরমল। এখন আর উপায়
কী? হয় এখন তিনটে লাশ ফেলে যেতে হয় নইলে নাগরমলের সঙ্গে একটা
বন্দোবস্তে আসা যায়।

এক সময়ে নাগরমলকে লক্ষ টাকার মাল দিয়েছে লালদু। সেটা নাগরমল
ভোলেনি।

বলল—কিছু ক্যাশকিড়ি দরকার থাকে বলুন না? আপনার সঙ্গে তো
অনেক বিজনেস করেছি। এ সব ছিনতাই কি ভাল লালদুবাবু? আপনার নামে
পাড়া কাঁপত এক সময়ে—

তিনটে লাশ ফেলার জন্য ট্রিগারে হাত রেখেছিল শান্দু! কিন্তু বাসবালে
নানা চিন্তা ভাবনা এসে যায়। বেপরোয়া হাওয়া যায় না কিছুতেই। তারা
দৃজনেই ঘরপোড়া গরু।

লালদু হতাশ হয়ে বলল—কিছু ছাড়ো নাগরমল, বাবসা করব।

—কত?

—দু হাজার করে দৃজন।

নাগরমল ভাবতে লাগল।

—ভেবো না। সময় নেই। শান্দু বলল।

নাগরমল শ্বাস ফেলে বলল—কাল দেবো। বাড়ীতে বসে পেয়ে যাবেন।
আজকের ক্যাশ গোনা আছে।

—না দিলে কিন্তু—

নাগরমল হাসে—আপনার সঙ্গে বেইমানী? আমার প্রাণের ভয় নেই?

পরদিন নাগরমল নিজেই টাকাটা পৌঁছে দিল। বলল—কাল আমার
ড্রাইভার ক্রীনার আর কর্মচারীরা দেখেছে আপনাদের। তারাই বলেছে ওয়াগন
ব্রেকারদের। খুব হইচই হচ্ছে ওদের মধ্যে। একটু দেখবেন দাদা—ওরা ভাল

না। নীলুবাবু মরল, শানুবাবু পালাল ; আমাকেও ব্যবসা গুটোতে হবে।

লালু বুকল। নাগরমল ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হচ্ছে। আর যেন লালু হানা না দেয়।

লালু টাকা নিয়ে বলল—এটা ধার হিসেবে নিলাম নাগরমল। শোধ দেবো ব্যবসা করে।

নাগরমল মুখের একটা ভঙ্গী করে বলল—যা বোঝেন। আপনার সঙ্গে তো অনেক বিজনেস করেছি! আপনি ভাল লোক।

দু হাজার নিয়ে শানু কাটল। বাকী দু হাজারে দস্তদের গ্যারেজটা ভাড়া নিয়ে মনোহারী দোকান খুলল লালু। দোকানে তার লজেন্স, বিস্কুট, চানা-চুর, বেলুন আর খেলনাই বেশী। পাড়ার বাচ্চারা ই তার প্রধান খদ্দের।

লাভালাভের হিসেব রাখতে পারে না লালু। বেচে যায়। পাড়ার লোকে যাতায়াতের পথে লালুর দোকান দেখে থমকে দাঁড়ায়—দোকান দিলে নাকি হে!

এক গাল হাসে লালু—দিলাম। আমাকে একটু দেখবেন, কাকা।

বোঁবি ফুড কোথাও পাই না, এনে দেবে নাকি। র্যাকের দামই না হয় দেবো।

—দেখবো।

লালু এইরকমভাবে ব্যবসা শুরু করল। মাল বেশী রাখে না, কিন্তু দুপ্রাপ্য জিনিস ঠিক এনে দেয়। র্যাকের দাম নেয়। খুব আস্তে আস্তে সে টাকা পরসার হিসেব বুঝতে শুরু করল। এখন বাচ্চারা দশ পয়সার চানাচুর চাইলে ঠোঙা ভর্তি করে দেয় না। ছোটো মাপের ঠোঙা বের করে। ফাউ দেয় না। পয়সা গোনে। মাসের শেষে স্টক মেলায়। পাড়ার মধ্যে পান সিগারেটের একটা মাত্র দোকান, তার মালিক মদনা, কিন্তু মদনার ব্যবহার ভাল না, একটা মাত্র দোকান বলে দোকানটা চলে ভাল। দেখেশুনে লালু সিগারেটের একটা কাউন্টার খুলল, মদুদির দোকানের সওদা রাখল কিছু কিছু অনেক কষ্টে বের করল বোঁবি ফুডের লাইসেন্স। ফলে দস্তদের গ্যারেজ ঘরে তার দোকানটা হু হু করে চলতে থাকে। মাসে শ তিনেক টাকা আয়।

মিলু এখন ইস্কুলে যায়। বাবা রিটারার করে বসে আছেন। বাইরের দিকের বারান্দায় পাতা ইঁজিচেয়ারে বসে সারাদিন খবরের কাগজটা উল্টে পাগেটে পড়েন। মায়ের চোখে ছানি আসছে। তবু মা সারাদিন ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। লালু মাঝে মাঝে বলে—মা, তোমাকে একজন রান্নার লোক রেখে দিই।

মা হাসে, বলে—রান্নার জন্য পাকা লোক চাই। স্বঘর, ভিন্ন গোত্রের একটা মেয়ে। এনে দে দেখি।

লালু বড় লজ্জা পায়। গলার বাঘনখটা মুখে পুরে ভাবে।

পাড়ার গিন্নীবাম্মির আগে লালুর দোকানে আসত না। তারা সভয়ে বলত—বাব্বাঃ গুণ্ডার দোকান? ওখানে মেয়েমানুষ যায় কখনো? কিন্তু

ধীরে ধীরে তাদের মত পাণ্টায়। এখন পাড়ার বউ-ঝিরা আসে, আসে প্রৌঢ়ারা। লালদু সবাইকে দিদি, মা, মাসী বলে ডেকে খুব খাতির করে।

সবচেয়ে বেশী ঝামেলা চাটুজ্জ খুড়ীকে নিয়ে। লালদুকে তার আফিং এনে দিতে হয়। আফিং নিতে এসে চাটুজ্জ খুড়ী পাড়া জানান দিয়ে চেঁচামেঁচি শুরু করে—বিয়ে করছিঁস না কেন? তোর বাপ দাদা বিয়ে করেছে, সংসার-সুখ লোক করছে, তুই করবি না কেন? গ্রিশ বছর বয়স হল না তোর! এর পর কি পাকা চুলে টোপর পরবি? বিয়ে না করলে বড়ো বয়সে পাগলামিতে ধরে, জানিস না?

- বিয়ে করব খুড়ীমা, সময় পাছিঁ কোথায়? একটু থিতু হয়ে নি।

—হ্যাঁ, ঢেউ সরে গেলে ডুব দিবি। বয়সকালটা মামদোবাজিতে কাটালি, এখন বদ্বন্দ্বিশুদ্ধি একটু হয়েছে—এইবারে কোথায় পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে বসবি তা নয়, কেবল উড়বার মতলব। বউ না থাকলে আবার মামদোদের খপ্পরে পড়বি কবে।

ভারী বিব্রত হয়ে সে তাড়াতাড়ি বলে—করব শীগগিরই করে ফেলবো বিয়ে। আর কটা বছর—মিলদুটার একটা বিয়ে দিয়ে নি—

—ও মা, ও তো গুয়ের গ্যাংলা মেয়ে—ওর বিয়ে হতে হতে তোর বয়স বসে থাকবে? পুঁলিপিঠের ন্যাজ বেরদুবার আশায় বসে থাকো তবে—

কিন্তু সময় বাস্তবিক বসে থাকে না। মিলদু স্কুল ডিঙিয়ে কলেজে ঢুকল, দেখতে না দেখতে ধাঁ করে বড় হয়ে গেল। চোখে চশমা, শাড়ি পরা মিলদু দোকানের সামনে দিয়ে কলেজে যায়। বিক্রিপাটার বাস্ততার মধ্যেও চোখ তুলে লালদু এক এক সময় দেখে মিলদুকে। তার বুক ভরে যায়। ভাগ্য ভাল যে ভাইবোনের চেহারায় মিল নেই, কালো হোঁতকা লালদুর বোনটা ফর্সা আর ছিপিছিঁপে হয়েছে। চেহারায় অমিল, কিন্তু বড় ভাব দৃঢ়নে। দাদার ওই বিশাল শরীরটা যে খাটাখাটনিতে রোগা হয়ে যাচ্ছে তা একমাত্র মিলদুই লক্ষ্য করে। গম্ভীর মুখে শাসন করে দাদাকে।

লালদু ভাবে—এইবার মিলদুর একটা বিয়ে দিতে হবে।

॥ দুই ॥

পাঁচ বছর পর।

এখন একা ঘরে লালদুর বাস। শরীরটা তেমনি আছে তার। কেবল পেটে চাঁব জমেছে একটু, মাথার চুল কয়েকটা পেকেছে। ছত্রিশে পা দিল সে। চোখে চশমা। মিলদুর বিয়ের পর পরই। প্রথমে বাবা গেল এক সকালে। সামনের বারান্দায় বসে ইঁজিচেন্নারে খবরের কাগজ মুখে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর উঠল না।

দু বছর পর মা। ফাঁকা ঘরে একা লালু। ভাল লাগে না। দিন কেটে যায়।

লালু এখন পাড়ার ভাল লোক। লোকে বাকীতে জিনিস পায়, প্রশংসা করে। দোকানটা বিলেত বাকী পড়ে ঝাঁঝা হয়ে আসছে। লালুর তাতে কিছুর যায় আসে না। সে একা। চলে যাবে।

বিকেলের ডাকে মিল্লুর একটা চিঠি পেল লালু। তাতে লেখা—একবার এসো। খুব জরুরী দরকার।

বুকেটা কেঁপে উঠল। মিল্লু বিয়েটা ভাল করেনি, নিজের পছন্দমতো বর বেছেছিল। ছেলেটা চোখা, চালু। কিন্তু মিল্লুর সঙ্গে মানায় না। গোর কিংবা ঘর ঠিকই ছিল তবু ছেলেটা বড় বেশী চালু। বহু মেয়েকে বাঁদর নাচ নাচিয়েছে। বিলাসকে তাই পছন্দ হয় না লালুর। কিন্তু মিল্লুর বর বলে সমীহ করে চলে। সবসময়ে তার বুকের ভিতরটা খাঁ-খাঁ করে—মিল্লুকে নিয়ে থাকবে তো বিলাস? অন্য দিকে ঝাঁকবে না তো?

দোকানের সামনে একটা টুল পেতে শানু বসে থাকে আজকাল। পণ্ডাশ প্রায় ছল সে। তার অর্ডার সাপ্লাইয়ের বাবসাটা জমেনি। জোড়াতাড়া দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছে। বয়সের জন্য নয় চিন্তার ভারেই কুঁজো হয়ে গেছে একটু। বয়সের তুলনায় বেশ বড়ো দেখায়। লালুর সঙ্গে বসে দুইগুণ যৌবনকালের নানা গল্প করে। মাঝে মাঝে বলে—এ সব ঝিমোনো ব্যবসা কি আমাদের লাইন? চল লালুদা আর এক বার হুজুত বাধাই, লুটেপুটে আনি। শেষ জীবনটা সুখে কাটিয়ে দিই চলো। আমাদের আমলে এমন সোনার দিন আর আসেনি।

লালু হাসে। চুপ করে থাকে।

চিঠি যেদিন পেল সেদিনও শানু বসে আছে বাইরের টুলে। চিঠিটা ভাঁজ করে বুকেপকেটে রেখে লালু উঠল, শানুকে বলল—দোকানটা একটু দেখিস শানু, আমি ঘুরে আসছি।

চললে কোথায়?

—মিল্লুটা চিঠি দিয়েছে, কী আবার গোলমাল ওদের।

শানু উদাস গলায় বলে—ওসব ছেড়ে দাও লালুদা, যে যার মতো চলুক। সংসারের কোনো জ্ঞানই তো তোমার নেই।

—তা ঠিক। কিন্তু শানু, সারা পৃথিবীতে ওই আমার একটা আপনজন।

শানু ভাবে। ভেবে বলে—সেটা সত্যি। ঠিক আছে। যাও।

বাইরের ঘরে উদাস শব্দকনো মূখে মিল্লু বসে আছে। তার হাঁটুর কাছে দু বছরের বাচ্চা মেয়ে জুঁলেখা! লালুকে দেখে হরিণীর মতো সচকিত তাকাল মিল্লু।

—কী হয়েছে মিল্লু?

মিল্লু ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে সতর্ক করে দিল, ইঙ্গিতে শোয়ার ঘর দেখিয়ে বলল—ও আছে।

হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে এল লালদুকে । পায়ে পায়ে ঘুরছে ছোট্ট
জুঁলেখা । তাকে কোলে নিয়ে গায়ের শিশু গন্ধ বুক ভরে নেয় লালদু । তার
শৈশব ফিরে আসতে থাকে ।

—কী হয়েছে ?

—সেই একই ব্যাপার । আমাকে ওর পছন্দ নয় । পরশু রাতে মেরেছে ।

—মেরেছে ?

—হ্যাঁ । এই প্রথম । কিন্তু এখন মারটা চলবে । হাত এসে গেছে ।

রাগে বোবা হয়ে গেল লালদু, কণ্ঠে বলল—মিলদু তোকে কেউ কখনো
মারেনি ।

মিলদু ঠোট কাঁপতে থাকে । চোখ ভরে জল আসে ।

—খুব লেগেছিল ?

মিলদু মাথা নাড়ে । লেগেছিল ।

—ও কী চায় ?

—কী জানি । বলে মিলদু কাঁদতে থাকে ।

—ও তোকে চায় না ?

—না ।

—তবে আমার কাছে চল মিলদু । বেশ থাকবো ভাইবোনে ।

—না । মাথা নাড়ে মিলদু ।

—তবে কী করবি ?

—সে জনাই তো তোমাকে ডেকেছি । কী করব বল ?

লালদু একটা শ্বাস ছাড়ে । বলে—ওর সঙ্গে একটু কথা বলি ।

জুঁলেখাকে নামিয়ে দিয়ে লালদু ঘরে আসে ।

বিলাস বিছানার শূয়ে আছে । ভারী ক্লান্ত আর রোগা দেখাচ্ছে তাকে ।
বিনম্র মুখ ।

—বিলাস ।

—উঁ !

—কী হয়েছে ?

বিলাস চোখ চায় । আশ্তে করে বলে—ওকে জিজ্ঞাসা করুন ।

—করেছি । তুমি ওকে মেরেছো । কেন ?

বিলাস ঠোট উল্টে বলে—ইচ্ছে ।

—কেন মারবে ? ওকে কেউ কখনো মারেনি ।

—আমি মেরেছি । আমার ইচ্ছে । কার বাবার কী ?

লালদু ধমকায় ! সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপে ।

—তার মানে ?

বিলাস উঠে বসে, একটা সিগারেট ধরায় । তারপর আশ্তে আশ্তে বলে শোধ

নেবেন ? নিন না ! কিন্তু বলে রাখছি, ও আবার মার খাবে ।

—না খাবে না ।

—খাবে । কোনো শৃঙ্খলের বাচ্চা ঠেকাতে পারবে না—

পলকে সব ভুল হয়ে যায় । ছত্রিশ বছর বয়স, চোখে চশমা—সব ভুল হয়ে যায় । পনেরো ষোলো বছর আগেকার এক জ্যোৎস্নায় আলোকিত নিজর্ন তাতাল মনে পড়ে কেবল । আর শরীরের মধ্যে ঝড় ওঠে বহুকাল বাদে ।

প্রকাণ্ড হাতখানা বাড়িয়ে বিলাসকে শুনো তুলে নেন লালদু । অনা হাত আঘাতের জন্য উদাত ।

মিলদু ছুটে আসে, চীৎকার করে বলে—দাদা, মেরো না । মরে যাবে ।

হকচাকিয়ে যায় লালদু । ঠিক তো । এই ভাবেই একদিন ননী গিয়েছিল তার হাতে । তারপরও পটা ওস্তাদের কাছে শেখা মার । কাজটা ঠিক হবে না । শিশুর মতো দৃ হাতে ধরে বিলাসকে আবার মেঝের ওপর ছেড়ে দেয় লালদু ।

কিন্তু বিলাস ছাড়ে না । পরসা জমানোর একটা মাটির ঘট রাখা আছে তাকে । বিলাস প্রথমে পাগলের মতো সেইটে ছুঁড়ে মারে ।

ভারী ঘটটা মাথায় লেগে চৌচির হয়ে ভেঙে যায় । লালদুর সমস্ত শরীর বেয়ে পরসার ধারা নেমে ঘরময় ছড়াতে থাকে ক্ষীণ একটা রক্তের ধারা সেই সঙ্গে । বিলাস ছুঁড়ে মারে জ্বলেখার খেলনা, কালির দোয়াত, পেপারওয়াটে । তাতে খুশী হয় না । দৃ হাতে ঘুরি মারে লালদুর মূখে, পেটে মারে লাথি । বিলাসের বারবার একটা ভারী বাঁধানো ফটোগ্রাফ ছিল দেয়ালে । রাগে পাগল হয়ে সেইটে টেনে আনে সে । কানা দিয়ে উপযর্দপরি মারতে থাকে মাথায় মূখে । কাচ ভেঙে ঢুকে যায় লালদুর মুখের চামড়ায় ।

লালদু ধীরে ধীরে মেঝেতে বসে । তারপর দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বোজে । একটাও মার ঠেকাবার চেষ্টা করে না । জ্বলেখা চীৎকার করে কাঁদতে থাকে, মিলদু চীৎকার করে দৃজনের মাঝখানে এসে পড়ে, বিলাস তাকে হাতের কাপড় দিয়ে সিরিয়ে দিয়ে পাগলের মতো আবার আক্রমণ করে লালদুকে ।

তারপর এক সময়ে সে থামে । চারদিকে চেয়ে দেখে । তার চোখে আতঙ্ক দেখা যায় । সে লালদুর রক্তাভ বিভৎস নিস্পন্দ দেহখানা দেখে ! হঠাৎ সংবর্ত পেয়ে কেঁপে ওঠে । দৌড়ে আলনা থেকে প্যান্ট টেনে নিয়ে পরে গায়ে শার্ট চাপায়, খুব তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সে ।

সদর দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভিতরের ঘরের দিকে চেয়ে বলে—মিলদু, মিলদু আমাকে ক্ষমা করো, লক্ষ্মী সোনা আমার—

দাদাকে দৃ হাতে জাপটে বসেছিল মিলদু । পাথর হয়ে । তবু বিলাসের কথা তার কানে গেল । হরিণীর মতো সচকিত হয়ে উঠল সে । বিলাস—বিলাস কি তবে ভালবাসে তাকে ? এখনো ? চকিতে বিদ্রোহ স্পর্শে উঠে দাঁড়ায় সে । ছুটে আসে দরজায় ।

বিলাস সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে। পালাচ্ছে।

শোনো, শোনো। ডাকে মিল্দ।

বিলাস তার ভয়াত সুন্দর মৃদুখানা ঘুরিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

দরজার চৌকাঠে হাত রেখে মিল্দ কাঁপতে থাকে, কাঁদে। অস্ফুট গলায় বলে—তুমি কি এখনো আমাকে ভালবাস?

বিলাস দ্রুত ধাপ সিঁড়ি উঠে আসে বলে,—বাসি মিল্দ, চিরকাল বেসেছি। তুমি বোঝ না?

মিল্দ আশ্তে করে বলে—তোমার ভয় নেই, দাদা মরেনি। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরো।

বিলাস অবিশ্বাসের চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর মাথা নাড়ে। ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে নেমে যায়।

ভাঙা কাচে আকর্ষণ মেঝের ওপর শিশু জুঁলেখা দাঁড়িয়ে। তার চোখে জল, সে কাঁদছে। এক পা এক পা করে এগোচ্ছে লালদুর দিকে।

ভাঙা, রক্তাক্ত মৃদু তুলে লালদু জুঁলেখাকে দেখল।

—আঃ জুঁলেখা, চারদিকে কাচ মা, তোমায় পা কেটে যাবে।

সে ফিস্ ফিস্ করে বলল।

জুঁলেখা তবু ভাঙা কাচ মাড়িয়ে এক পা এক পা করে আসছে।

চোখের রক্ত মূছে নেয় লালদু। তারপর দ্রুত হাত বাড়িয়ে কোলে নেয় জুঁলেখাকে। শিশু-গন্ধ তার বুক ভরে যায়।

—আঃ জুঁলেখা, আমার তেমন লাগেনি মা। কেঁদোনা। আমি ঘোড়া হই, তুমি আমার পিঠে চাপো।

লালদু শিশু হয়ে থাকে। লালদু শিশু হয়ে যায়। ভাঙা মৃদু, রক্তাক্ত শরীর, মাথার ভিতবে এক আংশিক অন্ধকার—তবু নিজেকে নিরাভিমান লাগে তার। রাগদ্রবহীন প্রকাণ্ড শিশুর মতো সে জুঁলেখাকে ভোলাতে থাকে। জুঁলেখাকে পিঠে নিয়ে আকর্ষণ কাচ খণ্ড পরসার রক্তের ফোঁটার ওপর সে হামা দিয়ে ফেরে সারা ঘর। মৃদু তার অনাবিল হাসি।

দরজায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা হাঁ করে দেখে মিল্দ।

খেলার ছল

মিঠুর গোল গোল মোটামোটো দুটো পায়ের একটা জীবনের বৃকের ওপর আর একটা তার শোনানো হাতে। তার বৃকের ওপর কাত হয়ে শূন্যেছে মিঠু, ঘাড়ের কাছে মাথা আর ল্যাভেণ্ডারের গন্ধময় চুল। জীবন কানের ওপর মিঠুর দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস আর কবিতা আবৃত্তি শুনতে পাচ্ছিল : ঝরনা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা, তাহারি মাঝারে দেখে আপনার সূর্য-তারা। তারি একধারে আমার ছায়াই আনি মাঝে মাঝে দুলায়ে তাহারে, তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ে কলধ্বনি...একটা ছোট নরম হাতে মিঠু তার বাবার গাল ধরে মৃদুতা ফিরিয়ে রেখেছে তার দিকে ! জীবন অনামনস্ক ভাব দেখালেই মৃদু তেনে নিয়ে বলছে 'শোনো না বাবা !'

মিঠুর ভারী শরীর, নরম তুলতুলে। বৃকের ওপর যেখানে মিঠুর পা সে জায়গাটা অঙ্গ ধরে আসছিল জীবনের। পা-টা একবার সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে মিঠু দাঁপিয়ে উঠল। পরমুহুর্তেই উঠে এল জীবনের বৃকের ওপর, দুই কনুইয়ের ভর রেখে জীবনের মৃদুতর দিকে হেসে হঠাৎ অকারণে ডাকল—
'বাবা !'

'উঁ !'

'তুমি শুনছো না !'

'শুনছি মা-মাণি।' জীবন চোখ খুলে তার ছয় বছরের শ্যামবর্ণ মেয়েটির দিকে তাকাল, হঠাৎ তার বৃক কানায় কানায় ভরে ওঠে। চুলে ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ, চোখে কাজল, মৃদু অঙ্গ পাউডারের ছোপ—এত সকালেই মেয়ে সাজিয়েছে অপর্ণা। না সাজালেও মিঠুকে দেখতে খারাপ লাগে না। কী বড় বড় চোখ, আর কী পাতলা ঠোঁট মিঠুর। জীবন মিঠুকে আবার দৃহাতে আঁকড়ে ধরে বলে, 'তোমার কবিতাটা আবার বলো।' মিঠু সঙ্গে সঙ্গে দূলে উঠে, 'ঝরনা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা...' শুনতে শুনতে সকালের গড়িমসির ঘুম ঘুম ভাবটা আবার ধীরে ধীরে জীবনকে পেয়ে বসতে থাকে। বলতে কি সারাদিনের মধ্যে মিঠু আর তার বাবাকে নাগালে পায় না, সকালের এটুকু সময় ছাড়া। তাই এটুকুর মধ্যেই সে পুষিয়ে নেয়। ধামসে, কামড়ে, কবিতা বলে, গান গেয়ে বাবার আদর কেড়ে খায় ; জীবনের মাঝে মাঝে বিশ্বাস হতে চায় না যে এই সুন্দর সুগন্ধী মেয়েটা তার !

মাঝখানের ঘর থেকে অপর্ণার গলা পাওয়া যাচ্ছিল। চাপা গলা, কিস্তু রাগের ভাব। মিঠু মাথা উঁচু করে মায়ের গলা শুনবার চেষ্টা করে বাবাকে

চোখের ইঙ্গিত করে বলল ‘মা !’ নিঃশব্দে হাসল—‘মা আতরদিকে বকছে ।
রোজ বকে ।’ জীবন নিঃস্পৃহভাবে বলে, ‘কেন !’ মিঠু মাথা নাড়িয়ে আনল
জীবনের গলার ওপর, তার থোকা থোকা চুলে জীবনের মৃদু আচ্ছন্ন করে দিয়ে
বলল, ‘আতরদি রোজ কাপড়িশ ভাঙে । সকালে দেরী করে আসে । মা বলে
ওকে ছাড়িয়ে দেবে ।’ বলতে বলতে টপ করে জীবনের বুক থেকে পিছলে নেমে
যায় মিঠু, মশারি তুলে মেঝের লাফিয়ে পড়ে । জীবন ওকে ধরবার জন্য হাত
বাড়িয়ে বলে, ‘কোথায় যাচ্ছে মা মণি !’ দরজার কাছে এক ছুটে পেঁঁছে
গিয়ে মিঠু ঘাড় ঘুরিয়ে বলে ‘দাঁড়াও দেখে আসি ।’

গোয়েন্দা ! এই মেয়েটা তার পুরোপুরি গোয়েন্দা । বাড়ির সমস্ত খবর
রাখে, আর সকালে বাবাকে একা পেয়ে চুপি চুপি বলে দেয় । বিশেষত
অপর্ণার খবর । মিঠু তার সহজ বুদ্ধিতে বুঝে গেছে যে বাবা মায়ের খবরটাই
বেশী মনোযোগ দিয়ে শোনে । গতকাল তাদের মোটর গাড়ীটার জ্বর হয়েছিল
কিনা, কিংবা তিনশ ছিয়ানব্বই নম্বর বাড়িতে কুকুরটার কটা বাচ্চা হল এসব
খবরে বেশী কান দেয় না । মিঠুর উত্তো হুচ্ছে মধু—জীবনের তিন বছর বয়সের
ছোট মেয়ে । সে মায়ের আঁচল ধরা, জীবনকে চেনে বটে কখনো সখনো কোলেও
আসে কিন্তু থাকতে চায় না । দুই মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে জীবন উঠে
সিগারেট ধরাল । মাথা ধরে আছে—কাল রাতের হুইস্কির গন্ধ এখনো যেন
ঢেকুরের সঙ্গে অঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে । কেমন ঘুমে জড়িয়ে আছে চোখের পাতা ।
কিছুতেই মনে পড়ে না কাল রাতে ‘বার’ থেকে কি করে সে ঘরের বিছানা
পর্যন্ত পেঁঁছতে পেরেছিল । কোনোদিনই মনে পড়ে না । কাল বিকালে
কারখানা থেকে তার ড্রাইভার তাকে ‘বার’ পর্যন্ত পেঁঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে
ফিরে এসেছিল । বার-এ দেখা হয়েছিল দুজন চেনা মানুষের সঙ্গে । আচার্য
আর মাধবন । তারপর ।

মিঠু ছোট্ট পায়ে দৌড়ে এসে মশারি তুলে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল জীবনের
কোলে । হাঁফাচ্ছে । এত বড় বড় চোখ গোল করে বলল, ‘আমাদের বিড়ালটা
না বাবা ফ্রিজের মধ্যে ঢুকেছিল ! মরে কাঠ হয়ে আছে ।’ একটু অবাক হয়ে
জীবন বলল, ‘সেকি !’ তার হাত ধরে টানতে টানতে মিঠু বলল, ‘চলো দেখবে ।
নইলে একদুনি আতরদি ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসবে ।’ কোত্‌হল ছিল না
তবু মিঠুকে এড়াতে পারে না জীবন, তাই হাই তুলে বিছানা ছাড়ল ।

ঘরের চারিদিকেই লক্ষ্মীর শ্রী । মেঝেতে পাতা চকচকে লিনোনিয়াম ।
ওপাশে অপর্ণা আর মিঠু মধুর আলাদা বিছানা । নিচু সুন্দর খাটের ওপর
শাওলা রঙের সাদা ফুলতোলা চমৎকার বেডকভার টান টান করে পাতা । মশারি
খুলে নেওয়া হয়েছে । ডানদিকে প্রকাণ্ড বুককেস যার সামনেটা কাচের, বুক-
কেসের ওপর বড় একটা হাইফাই রেডিও, তার ঢাকনার অর্গান্ডতে অপর্ণার
নিজের হাতের এমব্রয়ডারি, পাশে মানিগ্রাফ্ট রাখা, লেবু রঙের চীনেমারিটর

ফুলদানি সাদা ক্যাবিনেটের ভিতরে রেকর্ড চেঞ্জার মেশিন—কোথাও এতটুকু খুলোময়লা নেই। পুর্বের জানলা খোলা, নীল পাতলা পর্দার ভিতর দিয়ে শরৎকালের হাস্কা রোদ আর অগ্নি হিম হাওয়া আসছে। অপর্ণা ঘর বড় ভালবাসে, তা ছাড়া তার রুচি আছে। এর জন্য জীবন কখনো মনে মনে, কখনো প্রকাশ্যে অপর্ণাকে বাহবা দেয়। কোন জায়গায় কোন জিনিসটা রাখলে সুন্দর দেখায় জীবন তা ভেবেও পায় না, যদিও এসবই জীবনের রোজগারে অর্জিত জিনিস, তবু তার মাঝে মাঝে মনে হয় এই ঘরদোর এই ফ্ল্যাট বাড়ীটার আসল মালিক অপর্ণাই। সারাদিন ঘরে ঘরে অপর্ণা বড় ভালবাসা, স্বপ্নে, বড় মায়ায় এই সব কিছুর সাজিয়ে রাখে। জীবনের সন্দেহ হয় সে যখন থাকে না, তখন—পোষা গৃহপালিতের গায়ে লোকে যেমন হাত রেখে আদর করে তেমনি অপর্ণা রেডিও, বুককেস, সোফায় বা টেবিলে তার স্নেহশীল সতর্ক হাত রেখে আদর জানায়। তাই জীবন যখনই ঘরে ঢোকে তখনই মনে হয় এ সব জিনিস অপর্ণারই পোষমানা, এ সব তার নয়। তাই যখন সে ঘরে চলাফেরা করে বসে বা শব্দে যায়, যখন ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খোলে তখন সে তার নিজের ভিতরে এক ধরনের কুণ্ঠা ও সতর্কতা লক্ষ্য করে মনে মনে হাসে। বাস্তবিক অপর্ণা হয়ত তার এ স্বভাব লক্ষ্য করে না, কিন্তু জীবন জানে লোকে যেমন তাদের ঘরে ফিরে সহজ খোলামেলা আরামদায়ক অবস্থা ভোগ করে সে ঠিক তেমন করে না।

‘শীগগির বাবা’ বলতে বলতে মিঠু তাকে টেনে আনল মাঝখানের ঘরে। আসলে ঘর নয় প্যাসেজ। তিন দিকে তিনটে দরজা—একটা রান্নাঘর, অন্যটা বসবার, তৃতীয়টা তাদের শোবার ঘরের। তিন কোণা প্যাসেজের একধারে দেয়াল ঘেষে দাঁড়ানো ক্রীম রঙের ফ্রিজটা। রাতে যখন প্রায়ই ভীষণ ঘোর অবস্থায় খানিকটা এলোমেলো প্যাসেজের প্যাসেজ-টা পার হয় জীবন তখন সে মাঝে মাঝে ফ্রিজটার কাছে একবার দাঁড়ায় কোনদিন ঠান্ডা সাদা ফ্রিজটার গায়ে হাত রাখে। মনে হয় ঘুমন্ত সেই ফ্রিজটা তার হাত টের পেয়ে আস্তে জেগে ওঠে, সাড়া দেয়, জীবনের মনে হয় ফ্রিজটা এতক্ষণ যেন এই আদরটুকুর জন্য অপেক্ষা করেছিল। এখন দিনের বেলা সব কিছুর অনারকম। ফ্রিজটার দুটো দরজা দু’হাট করে খোলা, সামনে হাটু গেড়ে বসে আছে গম্ভীরমুখে অপর্ণা, তার পিঠে বন্ধকে মধু, আতর নীচু হয়ে তলার থাকে অম্বকারে কিছুর দেখবার চেষ্টা করছে। জীবন লক্ষ্য করে, সে এসে দাঁড়াতেই অপর্ণার শরীর হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। জীবন অগ্নি হেসে জিজ্ঞাসা করে ‘কি হল!’ অপর্ণা ফ্রিজটার দিকে চেয়ে থেকেই জবাব দিল ‘দেখো না, বেড়ালটা ভেতরে ঢুকে মরে আছে।’ জীবন অপর্ণার মুখের খুব সুন্দর কিন্তু একটু নিষ্ঠুর পাথরের প্রোফাইলের দিকে চেয়ে সহজ গলায় বলে—‘কি করে গেল ভেতরে!’ অপর্ণা সামান্য হাসে ‘কি জানি! হয়ত আমিই কখনো যখন ফ্রিজ খুলেছিলাম তখন ঢুকে গেছে। খেয়াল করিনি।’ জীবন সঙ্গে সঙ্গে সাস্থ্যনা দিয়ে বলে, ‘ওরকম ভুল হয়। ওটাকে বের করে ফ্রিজটা

ভাল করে ধুয়ে দিও, মরা বেড়াল ভাল নয়। আচ্ছা।' জীবন চলে যাচ্ছিল বাথরুমের দিকে হঠাৎ মনে পড়ায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আর আজ বাজারে যাবে বলছিলাম। ছুটির দিন। যাবে না।' এক বলক মদ্য ফিঁরিয়া জীবনের চোখে চোখ রাখল অপর্ণা, হাসল যাবো না কেন। একটা বেড়াল মরেছে বলে। তুমি তৈরি হও না। কথাটা ঠিক বুঝল না জীবন, শূন্য অপর্ণার ঐ এক বলক তাকানোর দিকে চেয়ে ওর সুন্দর ছোট কপালে সিঁদুরের চারপাশে কোঁকড়ানো চুল, ঈষৎ ফুলে থাকা অভিমানী সুন্দর ঠোঁট, নিখুঁত আর্চ-এর মতো ভ্রু আর খুঁতনির চিক্কণতা দেখে হঠাৎ নিজেকে তার বড় ভাগ্যবান মনে হল। বড় সুন্দর বউ তার। বড় সুন্দর অপর্ণা। ছেলেবেলা থেকে অনেকে এরকম বউ পাওয়ার আশায় বড় হয়ে ওঠে। ভেবে দেখতে গেলে জীবনের ছেলেবেলা ছিল বড় দুরন্ত বড় বোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির বড় দামাল দিন ছিল তখন। আজ একটা বেড়াল তার ফ্রিজ-এর ভিতর মরে পড়ে আছে, আর তখন সেই ছেলেবেলায় যখন ছিল চায়ের দোকানের বাচ্চা বয়, তখন উনানেব পাশে ছোট নোয়া যে চৌখুপী জায়গায় সে চট আর সত্তরগির বিছানায় শূতো তখন আর একটা বেড়াল তার মাথার কাছে শূয়ে থাকতো সারা রাত। মিনি নামে এই বেড়াল উনিশ শো পঞ্চাশে চক্রবর্তীদের তিনতলা থেকে দিয়েছিল লাফ। জীবন আজও জানে না বেড়ালটা আত্মহত্যা করেছিল কিনা। সেই সব ছেলেবেলার দিনে জীবন কখনো অপর্ণা বা অপর্ণার মতো সুন্দর অভিজাত বউ-এর কথা ভাবেই নি।

বাথরুমের বড় আয়নায় কোমর পর্যন্ত নিজের আকৃতির দিকে চেয়ে মৃদু হাসল জীবন। দুর্ধর্ষ কাঁধের ওপর শক্ত ঘাড়, বুকে দু'ধারে চোকো পেশী, দাঁতে রাশ ঘষলে হাতের শক্ত রগ, শিরা আর মাংসপেশীতে ঢেউ ওঠে। ছোটো করে ছাঁটা চুল, টানা, মেয়েলী এবং দৃষ্ণী এক ধরনের অন্ভূত চোখ তার। তার গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, যেমনটা মিঠুর। মধু তার মায়ের মতোই ফর্সা। জীবনের নাক চাপা, টোট একটু পুরু কিন্তু সুন্দর। তার সঙ্গে মিঠুরই মিল বেশী, মধুর সঙ্গে অপর্ণার। জীবনের চেহারায় পরিশ্রমের ছাপ আছে বোঝা যায় আলস্য বা আরামে সে খুব অল্প সময়ই ব্যয় করেছে। তৃপ্তিতে আয়নার দিকে চেয়ে হাসে জীবন। বাস্তবিক প্রায় ফুটপাথের রাস্তার জীবন থেকে এতদূর উঠে আসতে পারার পরিশ্রম ও সার্থকতার কথা ভাবলে তার মাঝে মাঝে নিজেকে বড় ভালবাসতে ইচ্ছে করে। সে তার বউ মেয়ে এবং পরিবারের জন্য কি সমস্ত কত'বাই করেনি! এই ভেবেই সে তৃপ্তি পায় যে এরা কেউ দৃষ্ণে নেই, জীবনের ওপর পরম নির্ভরতায় এরা নিশ্চিন্তে বেঁচে থেকে বেঁচে থাকাকে ভালবাসছে। সে নিজেকে কি বেঁচে থাকতেই ভালবাসেনি বরাবর। যখন সেই অনিশ্চিত ছেলেবেলায় সে কখনো চায়ের দোকানের বাচ্চা বয়, কখনো বা মোটর-সারাই কারখানার ছোকরা কারিগর তখনো সে রাস্তা পার হতে গিয়ে কৃষ্ণাঙ্ক গাছে ফুল দেখে আনন্দে গান গেয়েছে, খাদ্য অনিশ্চিত ছিল তবু প্রতিটি খাদ্যকণার কত

স্বাদ ছিল তখন। তখন দেশভাগের পর কলকাতার এসে রহস্যময় এই শহরকে কত সহজে চিনে নিয়েছিল জীবন। আজ সে যখন তার ফ্ল্যাটের ব্যালকনি থেকে, গাড়ির জানালা থেকে বা বার-এর দরজার কাচের পান্সার ভিতর দিয়ে দেখে তখন এখানকার রাস্তাঘাট, ভিড়, আলো কত দূরের বলে মনে হয়। কিংবা রাতে ঘোর মাতাল অবস্থায় ফিরে এসে যখন খাবার ঘরে ঢাকা খাবার খুলে সে সুন্দর সমস্ত খাবারের রঙের দিকে চেয়ে দেখে তখনো তার মনে হয় এ সব খাবারে কি সেই সব স্বাদ আর পাওয়া যাবে !

জীবন ঘরে ঢুকে দেখল ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে অপর্ণা মধুকে সাজাচ্ছে। জীবন বলল 'ও যাবে নাকি !'

অপর্ণা মধুর মাথায় রিবন জড়াতে জড়াতে বলল, 'যাবে না ! থাকবে কার কাছে ! যা বায়না মেয়ের !'

জীবন বিরক্ত ভাবে মধু ফিরিয়ে দেখল মিঠু মেঝের লিনোলিয়ামে থোলা 'হাসিখুশী'-র সামনে বসে হাঁ করে মা আর মধুর দিকে চেয়ে আছে। জীবন বলল, 'দোকানে দোকানে ঘুরতে হবে, ওকে নিলে অসুবিধে। কখন জলতেগটা পায়, কখন হিস পায় তার ঠিক কি !'

শুনে মিঠু মধুকে হাত চাপা দিয়ে হাসে। অপর্ণা তার ধীর হাতে মধুর মাথার রিবন সূঁচ দিয়ে দেয়। তেমনি গম্ভীর মধুকে একবার মিঠুর দিকে চেয়ে বলল 'ঠিক আছে।'

জীবন সঙ্গে সঙ্গে সহজ হওয়ার ভাব করে বলে 'অবশ্য তোমার যদি ইচ্ছে হয়—'

'না, থাক। আন্তর ত রইলই, ও দেখতে পারবে।'

'কাঁদবে বোধ হয়।'

'তা কাঁদবে।'

'কাঁদুক।' জীবন হাসে, 'কাঁদা খারাপ নয়, তাতে অভ্যাস ভাল হয়। জেদটেন্দ কম স্বাভাবিকতা আসে।'

অপর্ণা উত্তর দিল না।

জীবনের খয়েরী রঙের ছোটো সুন্দর গাড়িটা দরজার সামনে দাঁড় করানো। ড্রাইভার গাড়ির দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। জীবনের এক পা পিছনে অপর্ণা—ছাইরঙা সিল্কের শাড়ি, ছাইরঙা ব্লাউজ, হাতে ছাইরঙা বটুয়া, মাথায় এলো খোঁপা, পায়ে শান্তিনিকেতনী চিটি—বড় সুন্দর দেখায় অপর্ণাকে। পাশা-পাশি ষেতে কেমন অস্বস্তি হয় জীবনের। সে নিজে পরেছে সাদা টেরিলিনের শার্ট আর জিঞ্জ-এর প্যান্ট—নিঃসন্দেহে তাকে দেখাচ্ছে ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতো, তবু অপর্ণার পাশে কি কারণে যেন কিছতেই তাকে মানায় না। ড্রাইভারকে ইঙ্গিতে সরে যেতে বলে জীবন একবার পিছু ফিরে চাইল। ব্যালকনিতে

আতরের কোলে মধু, সে ভীষণ কাঁদছে, চোখের জলে মধু ভাসছে তার, রেলিঙের ওপর ঝুঁকে চেয়ে আছে মিঠু—বিষম মধু—জীবনের চোখে চোখ পড়তেই হাসল, হাত তুলে বলল ‘টা-টা বাবা ! দূর্গা দূর্গা বাবা !’ অপর্ণা খুব ওড়াতাড়ি ব্যালকনির দিকে চেয়েই চোখ সরিয়ে গাড়িতে ঢুকে গেল। জীবন হাসিমুখে হাত তুলে ব্যালকানিতে মিঠু আর মধুর উদ্দেশ্যে বলল, ‘শীগগিরই আসছি ছোটো মা ! টা-টা, দূর্গা দূর্গা বড়ো মা !’

‘টা-টা দূর্গা দূর্গা বাবা ! টা-টা দূর্গা দূর্গা !’

জীবন গাড়ি এনে দাঁড় করাল মোড়ের পেট্রোল পাম্পে। অপর্ণা নামল না। জীবন নেমে ধরাল একটা সিগারেট। আকাশে শরৎকালের ছেঁড়া মেঘ, রোদ উড়ছে। পেট্রল পাম্পের একদিকে বিরাট সাইন বোর্ড ‘হ্যাপি মোটোরিং !’ সেই দিকে চেয়ে রইল জীবন, হঠাৎ আলগা একটা খুঁশিতে তার মন গুন গুন করে উঠল ‘হ্যাপি মোটোরিং ! হ্যাপি হ্যাপি হ্যাপি মোটোরিং !’ যে বাচ্চা ছেলেটা মোটরে পেট্রল ভরল, হাত বাড়িয়ে তাকে একটা টিফি দিল অপর্ণা। খুশী হল জীবন। অপর্ণার মধু এখন পরিষ্কার ও সহজ। হায় ! কতকাল অপর্ণার সঙ্গে জীবনের ঝগড়া বা খুনসুটি হয় না। জীবন যা বলে অপর্ণা একটু গম্ভীর মুখে তাই মেনে নেয়। সত্যিই মেনে নেয় কিনা জীবন তা জানে না। অন্তত বিয়ের আগে অপর্ণা যে বাড়ির মেয়ে ছিল সে বাড়ির লোকেরা সহজে অন্য কারো কথা মেনে নিত না, বশ ও মানতো না। অপর্ণাই মানছে কি ! ঠিক জানে না জীবন। আসলে সারাদিনে তাকে অপর্ণার বা অপর্ণাকে তার কতটুকু দরকার পড়ে ! ভালো করে দেখাও হয় না। শুধু রাতে যখন সে ঘোরলাগা অবস্থায় ঘরের দরজায় পৌঁছোয়, আর দরজা খুলে দিয়ে অপর্ণা সরে যায় তখন প্যাসেজের আলো-আঁধারিতে সে এক বালক অপর্ণার সুন্দর কিন্তু নিষ্ঠুর মুখে একটু বিরাগ লক্ষ্য করে মাত্র। সেটুকুও ভুল হওয়া সম্ভব। তবু অপর্ণাকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে ভালবাসার কথা মনেও হয় না জীবনের।

সামনেই ট্রাফিকের হলুদ বাতি লাল হয়ে যাচ্ছিল। আগে একটা সাদা বড় গ্লিমাউথ ব্লথ হয়ে থেমে যাচ্ছিল। জীবন স্টিয়ারিং ডাইনে ঘুরিয়ে তাকে পাশ কাটাল, গতি কমাল না। জ্বলজ্বলে লাল আলোর নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে এল তার ছোট গাড়ি, আড়াআড়ি ক্রসিং-এর গাড়িগুলো সদ্য চলতে শুরু করেছে, জীবন অসায়াসে ধাক্কা বাঁচিয়ে বেরিয়ে গেল। অপর্ণা চমকে উঠে বলল, ‘এই ! কি হচ্ছে !’ জীবন বাঁ হাতটা তুলে অপর্ণাকে শান্ত থাকতে ইঙ্গিত করল শুধু। অপর্ণা ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের রাস্তা দেখে নিয়ে বলে, ‘পদূলিশ তোমার নাম্বার কল করেছে, হাত তুলে থামতে বলছে !’ জীবন গম্ভীর মুখে বলল, ‘যেতে দাও !’ অপর্ণা চুপ করে যায়। চওড়া সুন্দর গাড়িহাটা রোড দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে পার্ক সাকাসের দিকে। সকাল। ট্রাফিক খুব বেশী নয়। তবু সামনেই বাস স্টপে একটা দশ নম্বর বাস আড় হয়ে থেমেছে, ফলে পাশ কাটানোর রাস্তা

প্রায় বন্ধ । জীবন নিঃশ্বাসের সঙ্গে একটা গালাগাল দেয়, গাড়ির গতি একটুও কমায় না, তার ছোটো গাড়ি বাসটাকে প্রায় বদরুশ করে বেরিয়ে গেল । অপর্ণা কিছন্ন বলে না । শূদ্র তার বড় বড় চোখ কোত্থলে জীবনের মূখের ওপর বারবার ঘুরে যায় । জীবনের মূখ বড় গম্ভীর, কপালে অঙ্গুষ্ঠ ঘাম । যেতে যেতে জীবন, ভীষণ বেগে হঠাৎ স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আবার সোজা করে নিল, গাড়ি এত জোরে টাল খেল যে ড্যাশবোর্ডে মাথা ঠুকে গেল অপর্ণার । ‘উঃ ! গাড়ীর সামনের রাস্তায় চমৎকার সাজগোজ করা একটি যুবতী মেয়ে তিড়িং করে লাফ দিয়ে ট্রামলাইনের দিকে গিয়ে পড়ল । ঐ বয়সের মেয়েকে এরকম লাফ দিতে আর দেখিনি জীবন । সে ঘাড় ঘুরিয়ে আর একবার মেয়েটিকে দেখবার চেষ্টা করে, অপর্ণা হঠাৎ তীব্র গলায় বলে, ‘তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো ! এটা কি বাহাদুরি নাকি !’ জীবন তার গম্ভীর অকপট মূখ ফেরায়, ‘অপর্ণা আমরা একটু মদুশকিলে পড়ে গেছি ।’ অপর্ণা বড় চোখে তাকায় ‘মদুশকিল !’ জীবন রাস্তার দিকে তার পুরো মনোযোগ রেখে বলে ‘গাড়ীর ব্রেকটা বোধ হয় কেটে গেছে । ধরছে না ।’ অপর্ণা নিঃশব্দে শিউরে উঠে, চূপ করে জীবনের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলে ‘স্টার্ট’ বন্ধ করে দাও ।’ জীবন একটা টোম্পোকে পাশ কাটিয়ে নিল, অদূরে একটা ক্রসিং, আড়া-আড়িভাবে একটা লরি পাশের রাস্তা থেকে প্রকাণ্ড কুমীরের মতো মূখ বার করেছে—একদুনি রাস্তা জুড়ে যাবে । জীবন এই বিপদের মধ্যেও ছোট আয়নায় এক পলকের জন্য নিজের ভয়ঙ্কর উদ্ভিগ্ন ও রেখাবহুল মূখ দেখতে পেল, অপর্ণা চোখ বদুজ হাতে হাত মদুঠো করে ধরে আছে । জীবন হাত বার করে লরীর ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে নাড়ল, তারপর হাত নাড়তে নাড়তেই এক হাতে স্টিয়ারিং জীবন গাড়ীটাকে এক ঝটকায় মোড় পার করে দিল । অঙ্গুষ্ঠ ফাঁকায় জীবন । ‘স্টার্ট’ বন্ধ হচ্ছে না । বাপারটা বদুঝে পারছি না । একটু আগেও সব ঠিক ঠাক ছিল । অথচ অপর্ণা বস্ত্রবাহীন ফ্যালফ্যাল চোখে তাকায় ‘কি হবে তাহলে !’ ড্যাশবোর্ডে ঝুলছে স্টীলের চকচকে চাবির রিং, দোল খাচ্ছে । জীবন আর একবার স্টার্ট বন্ধ করার চেষ্টা করল । অপর্ণা শ্বাসরুদ্ধ গলায় বলে, ‘ঠেলা গাড়ি, ওঃ একটা ঠেলাগাড়ি...’ জীবন তার হাতের ওপর অপর্ণার নরম হাত টের পায়, বলে ‘ভয় পেও না, চেষ্টাও না, মাথা ঠিক রাখো, সামনে যতদূর দেখা যায় দেখে দেখে আমাকে বলো । ফাঁকা রাস্তা পাচ্ছি এখনো । বোধ হয় বেরিয়ে যাবো ।’ অপর্ণা হাতের দলপাকানো রুমালে চোখ মোছে । ‘—গাড়ির এত গন্ডগোল, আগে টের পাওনি কেন ? খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে বাতাস আসছে, তবু জীবনের কপালের ঘাম নেমে আসছে চোখে মূখে, জিভে সে ঘামের নোনতা স্বাদ পায়, বলে দিন পনেরো আগেই তো গ্যারেজ থেকে আনলুম, গীয়ারটা একটু...’ অপর্ণা হঠাৎ প্রায় লাফিয়ে উঠে বলে ‘বাঁ দিকে, বাঁ দিকে মোড় নাও, সামনে জ্যাম’ তিনটে রিকশা একে অন্যকে কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল, পাশ কাটাতে

গিয়ে গাড়ির বনেট লাগল একটা রিকশার হাতলে, ছোট একটা থাকায় রিকশাটাকে সরিয়ে বাঁয়ে মোড় ফিরল জীবন, রিকশাওয়ালা হাতল শূন্যে তুলে প্রাণপণে রিকশাটাকে দাঁড় করবার চেষ্টা করছে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে হাজরা রোডে ঢুকে উল্টোদিক থেকে আসা একটা ঘোলা নম্বর বাস-এর দেখা পায় জীবন। বাসটা একটা ধীরগতি কালো অস্টিন অফ ইংল্যান্ডকে ছাড়িয়ে যাবে বলে রাস্তা জুড়ে আসছে। দাঁতে ঠোট চাপে জীবন, টের পায় ঠোটের চামড়া কেটে দাঁত বসে যাচ্ছে, ফুটপাথ ঘেঁষে স্টিয়ারিং ঘোরার সে তবু বুদ্ধিতে পারে অত অল্প জায়গা দিয়ে গাড়ি যাবে না। চোখ বুজে ফেলার ভয়ঙ্কর একটা ইচ্ছে দমন করে সে দেখে ঘোলা নম্বর বাসটা তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, বাস-এর ড্রাইভার হাত বাড়িয়ে তার কান মলে দিয়ে বলতে পারে, 'শিখতে অনেক বাকী হে।' কিন্তু জীবন খুব অবাক হয়ে দেখল তার ছোটো গাড়িটা যেন ভয় পেয়ে জড়োসড়ো এবং আরো ছোটো হয়ে রাস্তার সেই খুব অল্প ফাঁক দিয়ে ফুরত করে বেরিয়ে গেল। নেশাগ্রস্তের মতো হাতে জীবন, 'অপর্ণা...' তাকিয়ে দেখে অপর্ণা দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। জীবনের ডাক শুনে শূন্য বলল 'আমার মেয়ে দূটো? মেয়ে দূটোর কি হবে?' মূহুর্তের জন্য স্টিয়ারিংভের ওপর হাত ঢিলে হয়ে যায় জীবনের। গাড়ি টাল খায়। দুর্বল সম্মুখের আবার সামলে নেয় জীবন। বলে, 'কৈ'দো না কাঁদলে আমার মাথা ঠিক থাকবে না। একটু ভুল হয়েছে তোমার, এই রাস্তায় মোড় নিতে বললে, কিন্তু রাস্তায় বড় ভিড়।' গাড়ি খুব জোরে চলছে না, জীবন চারিদিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছিল। অপর্ণা চোখের জল মূছে শক্ত থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করে বলে 'যেমন করে হোক বাসায় দিকে গাড়ি ঘোরাও।' জীবন স্থির গলায় বলে, 'তাতে লাভ কি; বাসার সামনে গেলেই কি গাড়ি থামবে!' অপর্ণা জোরে মাথা নাড়ে, 'না থামুক। মধু আর মিতু হয়ত এখনো বালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে।' জীবনের ঘাড় টন টন করছিল ব্যথায় সহজ ভঙ্গীতে না বসে সে অনেকক্ষণ তাঁর উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে আছে। বাঁ দিকে পর পর কয়েকটা সরু নোংরা গতি, মোড় ফেরা গেল না। সামনেই চৌরাস্তা, দূর থেকেই দেখল জীবন ট্র্যাফিক পলিশ অব-হেলার ভঙ্গীতে হাত তুলে তার সোজা রাস্তা আটকে দিল। অপর্ণা হঠাৎ জোরালো গলায় বলল 'ডান দিকে মোড় নাও, ওঁদিকে ফাঁকা রাস্তা তারপর রেইনী পার্ক...' কিন্তু জীবন মোড় নিতে পারল না, গাড়িটা অস্পের জন্য এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর সহজ নিশ্চিতভাবে ট্র্যাফিক পলিশটাকে লক্ষ্য করেই ছুটিছিল। লোহার হাতে স্টিয়ারিং সোজা রাখে জীবন, পলিশটার হাতের তলা দিয়ে তার গাড়ি ছোটো। বাঁকের মুখে নীল রঙের একটা ফিয়াট তার গাড়ির বাফারের থাকায় নড়ে উঠে থেমে কাঁপতে থাকে। ফিরেও তাকায় না জীবন দূটো লরিকে পরপর কাটিয়ে নেয়। পিছনের পলিশটা চোঁচয়ে গেল

দিচ্ছে। সামনেই হাজরার মোড়, লাল বাতি জ্বলছে, অনেক গাড়ি পর পর দাঁড়িয়ে। কিছুই ভাবতে হয় না জীবনকে। থেমে থাকা গাড়িগুলোকে বাঁয়ে রেখে অবহেলায় এগিয়ে যায়, আবার একটা ডবলডেকার, পিছনে লম্বা ট্রাম আড়াআড়ি রাস্তা জুড়ে যাচ্ছে, জীবন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে 'আজ কেবল লাল বাতি, রোজ এমন হয় না তো।' অপর্ণা বাঁ হাত বাইরে বের করে মোড় নেবার ইঙ্গিত দেখায়, ডবলডেকারটার মূখ কোনক্রমে এড়িয়ে জীবন গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারল। রাস্তা ফাঁকা নয় কিন্তু অনেকটা সহজ। বাঁয়ে মনোহরপুকুরের মূখ, একটু দ্বিধাগ্রস্ত হাতে গাড়ি ঘোরাবে কিনা ভাবতে ভাবতে জীবন সোজাই চলতে থাকে। কালীঘাটের স্টপে গোটা চার পাঁচ স্টেট বাস একসঙ্গে থেমে আছে। দূর থেকেই জীবন দেখে প্রথম বাসটা ধীর স্থিরভাবে স্টপ ছেড়ে যাচ্ছে, সে পৌঁছবার আগে আর বাসগুলো যে ছাড়বে না তা নিশ্চিত। ওখানে বাস স্টপের পাশেই একটা পাবলিক ইউরিন্যাল। আগে থেকেই জীবন তাই ট্রামের ট্রাকে তুলে দিল তার গাড়ি। অপর্ণা কি বলতে গিয়ে থেমে যায়। কিছু লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছে, তাদের গাড়িটাকে এবার অনেকের নজরে পড়েছে। জীবন কালীঘাট পেরিয়ে ট্রামের ট্রাকে ঘাস-মাটির জমির ওপর দিয়েই চলতে থাকে। লোকজন দূর থেকে চেঁচিয়ে কি বলছে। জীবন একটু ঘোলাটে চোখে অপর্ণার দিকে চায়, 'অপর্ণা...' অপর্ণা অর্থহীন চোখে তার মূখের দিকে তাকায়। জীবন বলে 'আমার কেমন ঘুম পাচ্ছে।' অপর্ণা বুঝতে না পেরে বলে 'কি বলছো?' জীবন মাথা নাড়ে চোখের সামনে আঁশ আঁশ জড়ানো একটা ভাব। অনেকক্ষণ সিগারেট না খেলে আমার এরকম হয়। আমি অনেকক্ষণ সিগারেট খাইনি। অপর্ণার চোখে জল টলমল করছে, রুমালের ঘষায় চোখের আশেপাশের জায়গা লাল বড় সুন্দর দেখায় তাকে। কপালের সিঁদূর অঁপ মূছে গেছে। তৎপর গলায় বলে, 'কোথায় তোমার সিগারেট?' জীবন তার দিকে চেয়ে বলে 'পকেটে।' অপর্ণা বলে 'বের করে দাও।' এবার সামনের মোড়ে সবুজ বাতি জ্বলছে, বালীগঞ্জের ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে বাঁকা হয়ে, ট্রাম ট্রাকের পাশে পাশে কয়েকটা গাছ হয়েছে, স্টপ লোকের ভিড়। তাদের গাড়িটা কাছে আসতেই লোকে চেঁচাচ্ছে। 'এটা কি হচ্ছে!' জীবন ক্রমান্বয়ে হর্ন দিয়ে ট্রামের ট্রাক থেকে রাস্তায় নামে। সামনে একটা নয় নয়। এটা ট্রলি বাস—প্রকাণ্ড বড়, আশ্তে আশ্তে রাস্তা জুড়ে চলে। জীবন হর্ন দেয়, বাসটাকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করা বৃথা—জায়গা নেই। ট্রাম ট্রাকের দিকে আবার মূখ ঘোরাতে গিয়ে জীবন দেখে তিন চারজন লোক রাস্তা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে বাঁয়ে স্ট্রিয়ারিং চেপে ধরে জীবন। কংক্রীটে প্রবল ধাক্কা দিয়ে গাড়িটা সোজা ফুটপাথে উঠে যায়। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের গাড়িবারান্দার তলা থেকে একেবারে শেষ মূহুর্তে লাফিয়ে কাঁপিয়ে কয়েকজন লোক সরে যায় জীবনের গাড়ির মূখ থেকে।

জীবন গালাগাল শুনতে পায়—‘এই শুল্লোরের বাচ্চা, হারামী...ছোট আন্ননার দিকে তাকিয়ে দেখে কয়েকজন তার গাড়ির পিছন নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে পিছিয়ে পড়তে থাকে। তারা দূর থেকে হাত নেড়ে শাসায়। মুক্ত-অঙ্গনের সামনে জীবন ফুটপাথ ছেড়ে আবার রাস্তায় নামে। একটা ঢিল এসে পিছনের কাঁচে চিড় ধরিয়ে দিল। এতক্ষণ উত্তেজনায় অপর্ণাকে দেখেনি জীবন, এখন দেখে অপর্ণা গাড়ির দরজায় ঢলে চোখ বুল্জে আছে। কপালে একটু জায়গা কাটা, একটা রক্তের ধারা খুঁতনি পর্যন্ত নেমে এসেছে।’ জীবন চোঁচিয়ে ডাকে—‘অপর্ণা!’ আস্তে চোখ খোলে অপর্ণা, কেমন বোধ ও যন্ত্রণাহীন দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ জীবনের মুখের দিকে তাকায়, হঠাৎ তীর আক্রোশে বলে ‘তুমি ছোটোলোক। তুমি বরাবর ছোটোলোক, ভিখারি ছিলে। তুমি কখনো আমার উপযুক্ত ছিলে না।’ ঠিক। সে কথা ঠিক। জীবন জানে। ফাঁকা সুন্দর রাস্তার দিকে চেয়ে সে বলে, ‘আমার ঘুম পাচ্ছে অপর্ণা। আমি রাস্তা ভাল দেখছি না।’ অপর্ণা তেমনি আক্রোশের গলায় বলে ‘ভেবো না। তুমি মরলেও আমার কিছন্ন যায় আসে না। আমি দরজা খুলে এক্ষুণি লাফিয়ে পড়ব।’ বলতে বলতেই দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দেয় অপর্ণা, আধখোলা দরজার দিকে ঝুঁকে পড়ে, দ্রুত হাত বাড়িয়ে অপর্ণার কনুইয়ের ওপর বাহুর নরম অংশ চেপে ধরে তাকে টেনে আনে জীবন। বলে ‘কপালটা কি করে কাটল! দরজায় ঠুকে গিয়েছিল। না! রুমালে ওটা মূছে ফেল, বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।’ বলতে বলতে লেকের দিকে গাড়ির মুখ ফেরায় জীবন, বলে ‘গাড়ির স্পীড, পঁচিশের মতো। এখন লাফিয়ে পড়লেও তুমি বাঁচবে না। যা নরম শরীর তোমার! কোনোকালে তো শক্ত কোনো কাজ করোনি!’ বলতে বলতে হাসে জীবন। অপর্ণা রুমালে মুখ চেপে ফোঁপায়, ‘কেমন অসম্ভব...অসম্ভব লাগছে...এমন সুন্দর সকালটা ছিল মিঠু মধু আর এখন! দৃজনেই হয়ত মরে যাবো।’ জীবন প্যাসেঞ্জার বাঁ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে গাড়ীর সীট-এর ওপরে রাখে, বলে ‘একটা সিগারেট আমার মুখে লাগিয়ে দাও তো! আর ধরিয়ে দাও।’ অপর্ণা কাঁপা হাতে জীবনের ঠোঁটে সিগারেট লাগায়। লেকের হাওয়া দিচ্ছে, অপর্ণা অনভ্যাসের হাতে দেশলাই ধরাতে গিয়ে পরপর কাঠি নষ্ট করে। জীবন মাথা নাড়ে ‘হবে না ওভাবে হবে না।’ বলতে বলতে ঠোঁটের সিগারেট নিয়ে অপর্ণার দিকে বাড়িয়ে দেয় ‘তুমি নিজে ধরিয়ে দাও। গাড়ির মধ্যে নীচু হয়ে বসে ধরাও।’ অপর্ণা প্রায় আতঁনাদ করে বলে ‘তার মানে? আমাকে মুখে নিতে হবে?’ জীবন একবার তার দিকে চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নেয়, ‘তাড়াতাড়ি করো। আমার বিদ্রী ঘুম পাচ্ছে।’ অপর্ণা একটু দ্বিধা করে, তারপর গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে পড়ে মুখে লাগিয়ে সিগারেটটা ধরানোর চেষ্টা করে। ধরায়, তারপর সিগারেট জীবনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আবার বলে, ‘ছোটোলোক, তুমি ছোটোলোক ছিলে।’

কোনোদিন তুমি সুন্দর কোনো কিছু ভালোবাসনি। ভেবো না আমি টের পাইনি। কাল রাতে যখন তুমি প্যাসেজ দিয়ে আসছিলে তখন আমি ফ্রিজ-এর দরজা খোলার আর বন্ধ করার শব্দ পেয়েছিলুম। স্টিয়ারিং হুইলের ওপর জীবনের হাতের পেশী ফুলে ওঠে 'তার মানে?' অপর্ণা হিস্‌সিগে গলায় বলে 'ওই বেড়ালটা, ওই সুন্দর কাবলী বেড়ালটা...তুমি কোনোদিন ওটাকে সহ্য করতে পারোনি।' লেক-এর চারধারে ফাঁকা রাস্তায় জীবন গাড়ি ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে। হাওয়া দিচ্ছে, প্রবল হাওয়ায় তার কপালে ঘাম শূন্যকরে যেতে থাকে, আর তার আবছা মনে পড়ে...হ্যাঁ মনে পড়ে...সে ফ্রিজ-এর দরজা খুলেছিল কাল রাতে। অপর্ণা ঠিক বলছে। অপর্ণা ঠিক বলছে। তার গাড়ি টাল খায়, ঘূড়ি ওড়াতে ওড়াতে একটা ছেলে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে, আকাশের দিকে চোখ। জীবন তার দিকে সোজা এগিয়ে যেতে থাকে অপর্ণা চীৎকার করে ওঠে 'এই-ই-ই...' ছেলেটা চমকে উঠে তাকায়, তারপর, দৌড়ে রাস্তা পার হয়। ঘূড়ির সুতো গাড়ির উইন্ড-স্ক্রিনে লেগে দূ-ভাগ হয়ে যায়। ভো—কাটা! জীবন হাসে। অপর্ণা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে 'আমাদের পিছনে একটা পুলিশের গাড়ি...', জীবন আয়নায় তাকিয়ে একটা কালো গাড়ি দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকের প্রথম রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নেয় সে, অক্ষপাণ পরেই তার গাড়ি লেক পার হয়ে ঢাকুরিয়া ওভারব্রিজ-এর ওপর উঠে আসে। ব্রিজ-এর নীচে একটা পুলিশ দূ-হাত দুদিকে ছাড়িয়ে তার গাড়িকে থামবার ইঙ্গিত করে। গ্রাহ্য না করে জীবন বোরিয়ে যেতে থাকে। অপর্ণা পিছন ফিরে দেখে বলে 'তোমার নম্বর টুকে নিল।' বলতে বলতেই আবার কেঁদে ফেলে অপর্ণা, 'তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত। তোমার অনেক বছর জেল হওয়া উচিত।' জীবন কথা বলে না। সামনেই যাদবপুরের ঘিঞ্জি বাস-টার্মিনাস, বাজার দোকানপাট। একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে, পিছনের চাকার কাছে একটা লোক বসে ঠুকঠাক করে কি যেন ঠিক করছে, একটা সাইকেল রিকশা মুখ ফেরাল। জীবন সোজা রাখে তার গাড়ি, রিকশার সামনের চাকা আর লরির পিছনের চাকার সেই লোকটার মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় সে স্পষ্ট টের পায় কিছু একটায় তার গাড়ির ধাক্কা লাগল, একটা চীৎকার শোনা যায়। সে মুখ না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দেখ তো লোকটা মরে গেছে কিনা!' কিন্তু অপর্ণা কি বলল শুনতে পেল না জীবন। তার কান মাথা চোখ জুড়ে দপ্ দপ্ করে চমকে উঠল একটা রগ। সে জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছো?' অপর্ণা অসুস্থ উত্তর দিল। শোনা গেল না। সামনে লোক, অজস্র লোক, সরু রাস্তা, রিকশা লাইন, নীচু দোকান ঘর...এইসব হিজিবিজি ছবির মতো তার চোখে দূলে দূলে উঠছিল। একটা বেড়াল, কাল রাতে একটা বেড়াল ফ্রিজ-এর মধ্যে সমস্ত রাত...না মনে পড়ে না, মনে পড়ে না...জীবন দেখল ব্যালকনিতে মধু আর মিঠু দাঁড়িয়ে, মিঠু তার বাবার মতো, মধু তার মায়ের মতো...তারা হাত নাড়ছে, টা-টা,

দুর্গা দুর্গা বাবা । অপর্ণা কিছড় বলছে ? কি বলছে তুমি ? সে জিজ্ঞেস করে, অপর্ণা শুধু কঁচকে তার দিকে তাকায়, হঠাৎ বাঁপিয়ে পড়ে স্টিয়ারিং সোজা রাখবার চেষ্টা করে। জীবন ঝাঁকুনি খেয়ে আবার ধোঁয়াটে ভাবটুকু কাটিয়ে নেয়। অপর্ণা কাঁদে—‘কি হচ্ছে...এবার তুমি মাথা খারাপ করছ। চারজনকে ধাক্কা দিলে পর পর ওরা টিল ছুঁড়ছে গালাগাল দিচ্ছে।’ বাস্তবিক টিল এসে পড়েছিল, পেছনে লোক দৌড়ে আসছে। সামনের দিকে একটা লোক বাঁশ ভুলে চাঁৎকার করছে ‘মাইরা ফালামু...’ জীবন ক্রান্ত গলায় বলল, ‘এত লোক কেন বলতো ! কেন এত অসংখ্য লোক ! ইচ্ছে করে খুন করে ফেলি।’ জীবন বাঁশ হাতে লোকটাকে পুরোপুরি এড়াতে পারল না, গাড়ির জানালা দিয়ে লোকটা বাঁশ ঢুকিয়ে দিয়ে সরে গেল। বাঁশের নোংরা ধারালো মুখটা তার গাল আর থুতনি কেটে, গলায় ধাক্কা দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে আবার বাইরে বোঁরিয়ে গেল। জীবন সীটের ওপর পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে বসে। মাথা ঠিক রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। তার চোখের সামনে হিজিবিজি, হিজিবিজি দোকানপাট, টেলিগ্রাফের পোস্ট, সিনেমার বিজ্ঞাপন, আর অজস্র মানুষের মুখ একটা ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতার ভিতর সরে যেতে থাকে। তার মাথা টলতে থাকে, ঘাড়ের মতো লাট খায়, সে সব ভুলে একবার সিগারেটের জন্য স্টিয়ারিং ছেড়ে হাত বাড়ায়, আবার স্টিয়ারিং চেপে ধরে। অপর্ণা কেবলই কি যেন বলছে, সে বদ্বন্ধে পারছে না। এখনো তার ট্যাঙ্ক ভর্তি পেট্রল। সে কলকল শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ক্রমে বাঘা যতীন, বৈষ্ণবঘাটা পেরিয়ে যায় জীবন। গাড়িয়ার পর হু হু করা রাস্তা। কিন্তু জীবনের কাছে ক্রমে সবকিছই আবছা হয়ে আসছিল। হঠাৎ জীবন যেন শেষ চেষ্টায় ব্রেকে পা দেয়, তারপর স্টিয়ারিং ছেড়ে দুহাত শূন্যে তুলে বলে ‘অপর্ণা আমি আর পারছি না, পারছি না...’ গাড়ি বেঁকে গেল রাস্তার ঢাল বেয়ে নেমে এল মাঠের ওপর। উঁচুনিচু খোয়াইয়ের মতো জমির ওপর দিয়ে কয়েক গজ এগিয়ে কাত হয়ে থেমে পড়ল।

আস্তে আস্তে চোখ খোলে জীবন। অপর্ণা গাড়ির ছোট্ট ফাঁকটুকু দিয়ে মেরুর ওপর পড়ে গেছে। ছোট্ট ছাইরঙা একটা পর্দটিলির মতো দেখাচ্ছে তাকে। জীবন আপন মনে হাসে, দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। এখনো সকালের মতো নরম রোদ, ধান কেটে নিয়ে ষাওয়া ক্ষেত। জীবন হাত পা ছাড়িয়ে একটু দাঁড়ায়, তারপর এসে দরজা খুলে অপর্ণাকে বের করে, মাঠের ওপর শূন্যে দেয়। আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দেয় তাকে ‘অপর্ণা, এই অপর্ণা...গালে থুতনিতে তীব্র জ্বালা টের পায় সে। গলায় ডেলা পাকানো ব্যাথা। এখনো অঙ্গ ধোঁয়াটে। অপর্ণা চোখ খোলে, অনেকক্ষণ জীবনের দিকে অর্থহীন চেয়ে থাকে। জীবন হাসে—‘ওঠো। উঠে বোসো। আমরা বেঁচে আছি।’

অপর্ণার চোখ জীবনের মুখ থেকে সরে আকাশের ওপর কয়েক মৃদুহৃৎস্র জন্য উড়ে যায়। তারপর আঁচল সামলে সে উঠে বসে। তার মুখের কঠিন

একটু নিষ্ঠুর অথচ সুন্দর পাথরের মতো প্রোকাইল ঘাসের সবুজ পশ্চাৎভূমিতে জেগে ওঠে। জীবনের মন গদন গদন করে ওঠে, ‘ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা...’ অপর্ণা দাঁড়িয়ে বলে, ‘এবার, তাহলে?’ জীবনের দিকে চায়, ‘তোমার মূখের ডানদিক কী ভীষণ লাল হয়ে আছে, কেটে গেছে অনেকটাই!’ জীবন হাতে অবহেলার ভাব ফুটিয়ে বলে, ‘ও কিছু না।’ রাস্তা থেকে জর্নিম পৰ্বন্ত এমন কিছু ঢালু নয়। জীবন ভেবে দেখে সে একাই গাড়িটা ঠেলে তুলতে পারবে। কয়েকজন পথ চলতি লোক দাঁড়িয়ে গেছে, মাঠের ওপর দিয়ে দূর থেকে দৌড়ে আসছে কয়েকটা কালো কালো ছেলে মেয়ে। জীবন অপর্ণাকে বলে ‘তুমি গাড়িতে উঠে বোসো, আমি এটাকে টেনে তুলছি।’ অপর্ণা ভ্রু কোঁচকায়, ‘তুমি একা পারবে কেন?’—‘পারব।’ অপর্ণা মাথা নাড়ে তা হয় না। পরমুহুর্তেই একটু অশ্রুত নিষ্ঠুর হাসে, হাসে সে ‘এক সঙ্গেই মরতে যাচ্ছলুম দুজনে।’ তা ছাড়া আমি তো তোমার সহধর্মিণীও, অনেক কিছুই ভাগ করে নেওয়ার কথা আমাদের। বলতে বলতে সে কোমরে আঁচল জড়ায়, গাড়িতে ‘হেঁইয়ো’ বলে ঠেলা দেয়, রাস্তার লোকেরাও কয়েকজন নেমে আসে। ‘কোথায় যাবে এটাকে নিয়ে! জীবন চিন্তিত মুখে বলে ‘কিছু দূরেই বোধহয় একটা পেট্রোল পাম্প আছে।’ যারা ঠেলাছিল তাদের একজন সায় দেয় ‘হ্যাঁ, আছে।’

বুড়ো মেকানিক খোলা বনেটের ভিতর থেকে মুখ তুলে জীবনের দিকে তাকায় ‘কই! কিছু পাচ্ছি না তো! কোনো গোলমাল নেই ইঞ্জিনে।’ জীবন চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে, ‘আমি জানি যে কোনো গোলমাল নেই।’ মেকানিক ঝাড়নে হাত মোছে—‘চালিয়ে দেখব?’ জীবন মাথা নাড়ল না। বলল, ‘বোধ হয় হনটায় একটু...’ মেকানিক বলল, ‘কানেকশানের গোলমাল? আচ্ছা দেখছি।’ কয়েক মিনিটেই কাজ সারা হয়ে গেল। অপর্ণা পেট্রল পাম্পের অফিস ঘরে বসে ছিল। জীবন ডাকতেই উঠে এসে গাড়ির কাছে একটু থমকে দাঁড়াল। জীবন তাকিয়ে ছিল। একটুও দ্বিধা না করে গাড়িতে উঠে বসল। জীবন গাড়ি স্টার্ট দেয়।

সারা রাস্তায় আর কথা হয় না দুজনে।

সন্ধ্যাবেলায় জীবন বসবার ঘরে সোফায় জানালার দিকে মুখ রেখে এলিয়ে পড়ে ছিল। মধু আর মিঠু আতরের সঙ্গে বেড়াতে গেছে পাকের। জীবন মনে মনে ওদের জন্যেই অপেক্ষা করেছিল। অপর্ণা এসে সামনেই দাঁড়াল! জীবন একবার চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

অপর্ণা জানালার থাকের ওপর বসে বলে, ‘তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল। জীবন দূর আঙুলে কপাল টিপে রেখে বলে, ‘বলো।’

অপর্ণার মুখ খুবই গম্ভীর—‘যখন পেট্রল পাম্পে বসেছিলুম তখন ওখানকার লোকটার সঙ্গে কথা হল আমার। আমি গাড়ির কিছুই বুঝি না, কিন্তু লোকটাকে যখন আমাদের গাড়ির গোলমালের কথা বললুম, তখন সে খুব অবাধ হয়ে বলল অত গোলমাল এক সঙ্গে একটা গাড়ির হতে পারে না। গাড়ি থামাবার অনেক উপায় নাকি ছিল।’

জীবন হাসে—‘ঠিক। সে কথা ঠিক।’

‘তবে গাড়ি থামেনি কেন?’

জীবন মাথা নাড়ে, ‘গাড়ি থামেনি গাড়ি থামানো হয়নি বলে।’

‘কেন? তুমি কি ঠিক করেছিলে আমাকে নিয়ে সহমরণে যাবে! নাকি এ তোমার খেলা?’

জীবন অস্থির চোখে অপর্ণাকে দেখে, ‘খেলা!’ পরমুহুর্তেই মুখ নীচু করে মাথা নাড়ে আবার, ‘কি জানি কেন আমি গাড়ি থামাতে পারিনি। থামানো সম্ভব ছিল না—এইমাত্র।’

‘কেন?’

‘কেন!’ জীবন শূন্য চোখে চারপাশে চায়, ভেবে দেখবার চেষ্টা করে, তারপর অসহায়ভাবে বলে, ‘কেন, তা তুমি বুঝবে না।’

ত্রু কোঁচকায় অপর্ণা, ‘বুঝবো না কেন? বোঝাও। আমি বুঝবার জন্য তৈরি।’

জীবন অপর্ণার চোখ এড়িয়ে যায়, কি একটা কথা যেন বলবার ছিল কিন্তু তা খুঁজে পাচ্ছে না সে, তবু সে স্তব্ধ হেসে হাস্কা গলায় বলে ‘তুমি কোনোদিন আমাকে সুন্দর দেখোনি, তাই না! কিন্তু আজ যখন ঐ ভিড়ের রাস্তায় প্রতি মুহুর্তে আকসিডেন্টের ঐ ভয়ের মধ্যেও আমি ঠিক পঁচিশ মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলুম—আমার মনে হয়—তখন আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। তুমি দেখোনি।’

জীবন মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখে অপর্ণার মুখ রাগে বলমল করে উঠল, ‘সুন্দর! কিসের সুন্দর। তুমি জানতে না তোমার সংসার আছে? দড়টো বাচ্চা শিশু মেয়ে তোমার? তোমার নিজের হাতে তৈরি কারখানা যা অনেক কষ্টে তৈরি করতে হয়েছে? কতগুলো মানুষ তোমার ওপর নির্ভর করে আছে সে কথা তুমি কি করে ভুলে যাও?’

জীবন বুঝতে পারে সে অপর্ণার সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছে, বশ্তুত তার কোনো যুক্তিই নেই, তবু হাসি ঠাট্টা বজায় রাখার চেষ্টার সে বলে ‘বোধ হয় তোমার কাছে একটু বাহবাও পেতে চেয়েছিলুম। তুমি তা দাওনি। কিন্তু মনে রেখো রাস্তায় ঐ ভিড়, পর পর অত বিপদের মধ্যেও আমি ঠিক পঁচিশ মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে গেছি, একবারও থামিনি। মনে রেখো, একবারও থামিনি।’

রাস্তায় একটা ন্যাংটো পাগলের দিকে লোকে যেভাবে তাকায় সেভাবেই অপর্ণা জীবনের দিকে এক পলক চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়, তারপর এই প্রথম সে জীবনকে নাম ধরে ডাকে. 'জীবন তুমি ছিলে রাস্তার ছেলে প্রায় ভিখারি। তোমার সঙ্গে কোন ব্যাপারেই আমার মিল নেই। ভাগ্য তোমাকে এতদূর এনেছে তবু আজ ঐ কাণ্ড করে তুমি সবকিছু ভেঙে তছনছ করে দিতে চেয়ে ছিলে। ডোবাতে চেরেছিলে নিজেকে, আমাদেরও। এর জন্যই কি তুমি বাহবা চাও ?'

জীবনের মাথার জল টলমল করে উঠে। অপর্ণার কথার ভিতরে কোথাও যেন একটা সত্য ছিল, কিন্তু জীবন তা ধরতে পারে না। তার প্রাণপণ ইচ্ছে হয় অপর্ণার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলে—তুমি ঠিক বলেছো অপর্ণা। ঠিক বলেছো। এই ঘর বাড়ি সংসার আমার নিজের বলে মনে হয় না। এখানকার খাবারে আমি এক কণা স্বাদ পাই না। আমার কেবলই ইচ্ছে এই সব কিছুর বৃকের ওপর দিয়ে একবার জোরে চালিয়ে দিই আমার গাড়ি। কিন্তু সে সব কিছুরই বলে না জীবন, মৃদু মৃদু হাসি টেনে আনে, তেমনি ঠাট্টার সুরে বলে, 'জীবনে সে কয়টি মৃদুতাই দামী যে সব মৃদুতেরে মানুষ মানুষকে সুন্দর দেখে! জন্ম থেকে তুমি কি কেবলই শিখেছো কি করে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা যায় ?'

মাথার ভিতরে, বৃকের ভিতরে এক অশুভ অস্থিরতা বোধ করে জীবন। অপর্ণা নিষ্ঠুর ধারালো চোখে কিছুদ্ধ চূপ করে তার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর সামান্য বিদ্রূপের মতো করে বলে, 'হায়, আমাদের কাবলী বেড়ালটারও সেই দামী মৃদুত বোধ হয় কাল রাতে এসেছিল যখন তাকে তুমি সুন্দর দেখেছিলে। আমি, আর তোমার দুই মেয়ে তো সুন্দর জীবন, তাদের জন্য এবার একটা বড় দেখে ফ্রিজ কেনো। দোহাই, জোরে গাড়ি চালিয়ে নাটক কোরো না।

হঠাৎ তীর এক অসহায়তা সঙ্গীহীন জীবনকে পেয়ে বসে। তার মাথার ভিতরে কল চলবার শব্দ, বৃকের ভিতরে কেবলই একটা রবারের বল লাফিয়ে ওঠে। তবু তার এই কথা বলবার ইচ্ছে হয়—ঠিক, তুমি ঠিকই বলেছো, অপর্ণা; আমার ঐ রকমই মনে হয়। এই সব ভেঙে-চুরে শেষ করে দিয়ে আমার আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে ছেলেবেলার সেই চারের দোকানের উনুনের পাশে, চট আর ছেঁড়া শতরঞ্জির বিছানায়, যেখানে দুঃখী রোগা এক মারাবী বেড়াল আমার শিররের কাছে শূয়ে থাকবে সারারাত। কিংবা ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেই মোটর সারাই কারখানায়, যেখানে লোহার জোড় মেলাতে মেলাতে আমি কৃষ্ণচুড়া গাছের ফুল দেখে গান গাইবো আবার। হ্যাঁ, অপর্ণা, আমি এখনো ছোটলোক, ভিখারি। মৃদু মৃদু হাসল জীবন তার মৃদু সাদা দেখাচ্ছিল, কোনোক্রমে সে গলার স্বরে এখনো সেই টাট্টার সুর বজায় রাখছিল, 'কে জানে তোমার কাবলী বেড়ালটাও আত্মহত্যা করেছিল কিনা !'

অপর্ণা কি বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে জীবন বলে, 'চূপ, অপর্ণা !' তারপর

স্থলিত গলায় জীবন বলে, 'তুমি সহমরণের কথা বলছিলে না। ধরে নাও আজ আমি তোমাকে সহমরণেই নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম ! তুমি বদ্বাবে কি এসব অপর্ণা ?'

অপর্ণা মাথা নাড়ে—না। তার চোখে জল, আর মুখের প্রতিটি রেখায় রাগ আর আক্কেশ। সে জীবনের দিক থেকে দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উঠে চলে যায়। জীবন বাধা দেয় না। শূন্য এতক্ষণ অপর্ণা যে জায়গার বসেছিল সেইখানে গম্ভীর চোখে চেয়ে থাকে, যেন এখনো অপর্ণা বসে আছে।

ঘরে কেউ ছিল না, তবু হঠাৎ জীবন চমকে উঠে বলে 'কে?' তারপর শূন্য চোখে চারদিকে চায়। সিগারেট আর দেশলাইয়ের জন্য চারদিকে হাতড়ে দেখে। বড় ক্লান্তি লাগে জীবনের, এলোমেলো অনেক কথা তার ভিতর থেকে ঠেলে আসতে চায়। মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করতে থাকে। সে ভীষণ অনামনস্কের মতো বলে, 'আঃ, অপর্ণা...!' পরমুহূর্তে চমকে ওঠে 'কেউ কি আছে?' কেউ ছিল না, তবু জীবন একবার পরম বিশ্বাসে দুটো হাত আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে শূন্য তুলে ধরে, যেন ভিক্ষুকের মতো বলতে চায়—আমাকে নাও।

দরজার কাছ থেকে মিঠু ডাকে, 'বাবা !'

অলীক আত্মসমর্পণের এক শূন্যতা থেকে জীবন আবার শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের বাস্তবতার ভিতরে দ্রুত ফিরে আসে।

প্রতীকার ঘর

টিকটিঁকিরা জল খায় না। বলে নতুন লোকটা খুব গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

আমরা কজন দেশলাই কাঠি দিয়ে জুয়ো খেলছিলাম! তাসটা খুব পুরোনো হয়ে গেছে। চলে না। ইস্কাবনের টেকা কি হরতনের গোলাম সবই ছেঁড়ার দাগ দেখে পিছন থেকেই চেনা যায়, টেকাটা ছিঁড়ছে পাশ থেকে মাঝখান অবধি, গোলামটার দুটো কোণা নেই, এরকম সব তাসই একটু খেয়াল করলেই চেনা যায় আজকাল। বাদু তাস বাঁটতে বাঁটতেই বলে—রশেট তোর ঘরে টেকা সাহেব গেছে, দেখ যদি বিবিটা পাস। শেষ তাসটা পিছন থেকে দেখেই মন বিগড়ে গেল। চিঁড়ের দুঁরি।

—ব্রাইন্ড দিবি না? হারু জিজ্ঞেস করে।

বিস্বাদ মুখে বললাম—প্যাক। তাস ফেলে নতুন লোকটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি—টিকটিঁকিরা জল খায় না?

লোকটা মুখ ফিরিয়ে আমার মুখটা একটু দেখল, বলল—জল খেতে কখনো দেখেছেন?

—না।

—তবে?

—শুনোছি টিকটিঁকি পেছাপ করে জল না খেলে...

লোকটা শ্বাস ফেলে বলে—ওসব আন কথা কান কথা। দেয়াল জুড়ে মরুভূমি, জল পাবে কোথায়?

কথাটা একটু ভাবতে থাকি, নতুন লোকটার মাথায় এত কথাও আসে!

ডালিম রাজার জোড়া পেয়ে দুটো কাঠি ব্রাইন্ড দিল। তাস সব চেনা। দেখেও যা, না দেখেও তাই। তবু ব্রাইন্ড আর সীন চাল আছে নিয়ম মাফিক। ব্রাইন্ড দিয়ে সে হারুকে বলল—কাল তেরোটা কাঠি জিতোঁছিলাম, তার মধ্যে সাতটা জ্বলেনি, ঠুকতেই বারদু খসে গেল।

হারু উত্তর দিল না। সে আমাদের একটা বুদ্ধি শিখিয়েছিল। দেশলাই কিনে কাঠিগদুলো লম্বালাষি রেড দিয়ে চিরে ফেলে সে। তাতে কাঠিটা দুভাগ হয়, বারদুদও দুভাগ হয়ে যায়। ঠিক মতো ঠুকে জ্বালাতে পারলে দুভাগ ই জ্বলে। একটা কাঠিতে দুটো কাঠি পেয়ে যাই আমরা। দেশলাই সম্পর্কে হারুকে আমরা এঞ্জপার্ট বলে মানি।

হারু উত্তর দিল না, কিন্তু নতুন লোকটা বলল—জ্বলবে কী করে? ওই

সাতটা কাঠিতে যে বারদদের বদলে মাটি লাগানো ছিল। আমিও কাল তিনটে কাঠি জ্বালতে পারিনি। কিন্তু আমার সব কিছু অভ্যাস খুঁটিয়ে দেখা, বারদ খুঁটে দেখলাম কাঠির মাথায় পোড়া দাগ। বারদগুলো পিষে দেখি মাটি।

ডালিম অবাক হয়ে বলে—বটে? কাজটা কার?

—হারদুবাবুর ছাড়া আর কার। দেশলাই উনি ভাল চেনেন।

হারদু রুখে উঠল না। কেবল ঠাণ্ডা চোখে নতুন লোকটার দিকে চেয়ে বলল—কাঠিতে আমার নাম সই করা ছিল?

—না। ভেবেচিন্তে বের করলাম।

ডালিম হাত বাড়িয়ে বলল—দেখি তোর কাঠিগুলো।

হারদু তার কাঠি সরিয়ে বলল—মাটি নয় রে। দেশলাইটা ডাম্প ছিল হয়তো!

ডালিম হাত বাড়িয়ে দুটো কাঠি ছিনিয়ে নিয়ে আঙুলে পিষে দেখল। মাটিই।

নতুন লোকটা ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজল। ডেক চেয়ারের বেতের বন্ধুনি কবে ছিঁড়ে গেছে! সেই ছেঁড়া জায়গা দিয়ে লোকটার পশ্চাদ্দেশ বুলে আছে। কিন্তু বসার ভঙ্গী দেখে কোনো অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হয় না। অভ্যাস হয়ে গেছে। চোখ বুজেই বলল—যখন পয়সার খেলা চালু তখন হারদুবাবু কী দিতেন?

ঠিক প্রশ্ন নয়, যেন অনেকক্ষণ বাদে একটা ভাববার মতো বিষয় পাওয়া গেছে বলে লোকটা গভীরভাবে ভাবতে লাগল চোখ বুজে।

বাদু অবাক হয়ে বলল,—মাইরি হারদু, এ যে কেষ্টনগরের কারিগরদের কাজ। সেবার মাসতুতো বোন চীনেবাদাম খেতে দিয়েছিল, ধরতেই পারিনি, কামড়ে দেখি মাটি! তুই শালা তো মাটির দেশলাইয়ের কাগরার খুললে লাথোপাতি হয়ে ঘাবি।

এসব কথায় আমার কান নেই, ভারী তো দেশলাইয়ের কাঠি? টিকটিকি জল খায় না—এ ব্যাপারটাই আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।

নতুন লোকটার দিকে চেয়ে বললাম—টিকটিকি জল খায় না, এ কথাটা ঠিকই। আমি ভেবে দেখলাম।

লোকটা শ্বাস ফেলে বলল—যখন আপনাদের পয়সার খেলা চালু ছিল তখন হারদুবাবু কী দিতেন বলুন তো!

একটু ভাবতে হল। বললাম—কী জানি! সেই কবে আমরা পয়সা দিয়ে খেলতাম তা কি আর এখন মনে আছে। এখন পয়সা পেলে সিগারেট কিনে ফেলি। খেলি না।

লোকটা বুদ্ধদ্বারের মতো মাথা নাড়ে।

কাঠের সুইং ডোরটা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর আপনা থেকে বন্ধ হয় না,

হাঁ হয়ে থাকে। ইঁদুরের থাকের মতো শব্দ করে। সেটা ঠেলে মতে ঘরে এল। হাতে ঝড়ু আর ফিনাইলের টিন, তার পরনে নীল হাফশার্ট আর নীল হাফ প্যান্ট। বলল—আজ নটার ট্রেনে প্যাসেঞ্জার আসছে। ঘর খালি রাখবেন।

ট্রেনের এখনো দেরী আছে। আমরা কেউ নড়লাম না। বাথরুমে মতের ঝাঁটার শব্দ হতে লাগল, আর ফিনাইলের ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া গেল। গন্ধটা আমার বেশ লাগে। আগে জামাকাপড় যখন বাল্ল থেকে বের করে পরতাম, তখন ন্যাপথালিনের গন্ধ ভুর ভুর করত। সে গন্ধটা এরকমই। আজকাল আর বাল্ল রাখার মতো জামা কাপড় নেই! সেই গন্ধটা আর পাই না। জামা প্যান্ট ময়লা হলে একদিন রাতে ফিরে বাংলা সাবান দিয়ে কেচে দিই। সকালের মধ্যে শুকোয় না। একটু ভেজা ভেজা থাকে। তা-ই পরে বোরিয়ে পড়ি, গায়ে গায়ে শুকিয়ে যায় ঠিক!

মতে বাথরুমে তালা দিয়ে আবার বোরিয়ে যাওয়ার সময়ে বলে গেল—প্যাসেঞ্জার আসছে কিন্তু মনে থাকে যেন।

প্যাসেঞ্জার অবশ্য খুব কমই আসে। উত্তরে একটা নতুন জংশন হওয়ার পর পাহাড় লাইনের যাত্রীরা ঐ জংশন থেকেই হিল-স্টেশনে চলে যায়। এদিকে কেউ বড় একটা উজ্জ্বল আসে না। সেইটে লক্ষ্য করেই আমরা কিছুদিন হল স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমটা দখল করে আছি। স্টেশন মাস্টারও কিছু বলেন না। তাঁর মেয়েদের আমরা কখনো হুড়ো দিইনি। তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে কলকাতায় গেলে আমরা তার কোয়ার্টার্সের পেঁপে কাঁঠাল আর নারকোল গাছ পাহারা দিইছি। তিনি বলে গিয়েছিলেন—বাবা, তোমরা দেখো। আমরা দেখেছিলাম। তিনি ফিরে এসে গাছে বোঁটাসুন্ধ ফল দেখে ভারী খুশী। অবশ্য তার ফিরে আসার দিন রাতেই আমরা সব পেড়ে নিই। আর মঙ্গলবারের হাটে বেটে সিনেমা দেখি। তবু তিনি আমাদের ওয়েটিং রুমের ব্যাপারে কিছু বলেন না। ঘরের বাইরে থাকলে আমাদের মাথায় অনেক বদখেয়াল আসে যে!

বাদু একটা সিগারেট অর্ধেক খেয়ে ডালিমকে দিল। চার টানের পর হারু পাবে! হারু চেয়ে আছে। আবার তাস বাঁটছে বাদু। খুব আন্তে আন্তে ধোঁয়া ছাড়ছে। আমার ভাগে একটা তিন আর একটা নলা পড়েছে। দেখে চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। শেষ তাসটা পড়ার পর পলক চেয়ে দেখলাম। ডারমন্ডসের গোলাম।

তাসটা বড় তাসে রেখে দিয়ে বললাম—টিকিটিকটা তাহলে পেছাব করে কী করে? অ্যা!

লোকটা চোখ বুজেই বলল—ট্রেনটা কি রাইট টাইমে আসছে?

—তাই কখনো আসে?

—একটা খবর নিন তো। সকালবেলাটার জ্বালালে। এ গরমে আর কোথায় যাবো?

—ওভারব্রীজ আছে। আমি বললাম।

—দূর। ওখানে বস্তু ভিখিরির ভীড়।

লাইন ক্রিয়ারের ঘণ্টার শব্দ শ্রুনে আমরা তাস গুটিয়ে বড় গোল টেবিল থেকে নেমে পড়লাম। নতুন লোকটাও উঠল।

ওভারব্রীজের সিঁড়ির তলায় ভিখিরিরা কাঠের উনুনে খাসির নাড়িভূঁড়ি সেদ্ধ করেছে। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে। ব্রীজের ওপরের দিকে কয়েকটা সিঁড়ি নেই। সেই গর্তগুলো সাবধানে আমরা পার হলাম। ছাউনি দেওয়া ব্রীজের উপরের টিন তেতে আছে। ধুলোর ঝাপটা মারছে গরম বাতাসে। পশ্চিমা কুলি আর বড়ো ভিখিরিরা গামছা পেতে টান টান হয়ে শ্রুয়ে। আমরা ফর্দ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে এক জায়গায় বসলাম। হারুন বলল—ডালিম তুই স্নান করিস না? গা থেকে চামসে গন্ধ আসছে!

—কুয়ো শ্রুকিয়ে আসছে। বাবা পরশু সকালে জল মেপে আমাদের দূভাইয়ের—বাদের চাকরি বাকরি নেই, তাদের স্নান বারণ করে দিল।

—জল মাপে কি করে? বাদু জিজ্ঞেস করে।

—দড়িতে গিঁট দেওয়া আছে। সেই গিঁট না ডুবলেই আমাদের স্নান বারণ হয়ে যায়। ডালিম বলে।

নতুন লোকটা বিজ্ঞের মতো বলল—কুয়ো দূরকন্মের আছে, ঝরনাকুয়ো আর বোমফাটা কুয়ো, আপনাদেরটা কোন রকম?

ডালিম বলল—আমাদেরটা বোমফাটা। কাটতে কাটতে হঠাৎ চড়াক করে এক জায়গা থেকে তোড়ে জল বেরিয়েছিল।

লোকটা বলল—ঐ কুয়োই খারাপ, জল শ্রুকিয়ে যায়। ঝরনাকুয়ো কাটালে খুব ডীপ হয়, আর চারধার থেকে ঝরঝর করে জল এসে কুয়ো ভরে ওঠে। তার জল শ্রুকোয় না।

পৃথিবীতে এত জল তবু যে টিকিটিকি কেন জল খায় না। ভাবতে ভারী অবাক লাগছিল আমার।

আমি নতুন লোকটাকে বললাম—আচ্ছা মশাই, দেয়াল ফুঁড়ে অশ্বথ গাছও তো ওঠে। সে শেকড় দিয়ে দেয়াল থেকেও রসকষ টেনে নেয়। টিকিটিকির তেমন কোন ইন্দ্ৰিয় নেই তো?

লোকটা আমার মূখের দিকে চেয়ে কী একটু মনোযোগ দিয়ে দেখল তারপর মূখ ঘুরিয়ে বলল—ঐ ট্রেন আসছে।

দেখলাম বাজারের লেভেল কসিং পার হয়ে ট্রেনটা হন্ হন্ করে আসছে। দূটো কুলি সেই শব্দে ঘূম ভেঙে উঠে মাথায় গামছা জড়াতে লাগল। আমরা ওভারব্রীজের রেলিঙের ফাঁক দিয়ে নীচে চেয়ে রইলাম।

দেখার কিছুই নেই এখানে। এক সময়ে ছিল ব্রিটিশ আমলে সাহেব-সুবোরা এই স্টেশনে নেমেই উত্তরের পাহাড় লাইনে যেত। তখন মেল ট্রেন ধামত এখানে,

সারাদাটা স্টেশনে গম্‌গমে ভাব ছিল, ওয়েটিংরুমে বার্মা সেগুনের ফ্যানিচার, সুন্দর জালের দরজাওলা রেস্টুরেন্ট, সবই ছিল। এখন উত্তরের জংশন হওয়ায় মেল ট্রেন আর এ পৰ্বন্ত আসে না। এটা হয়ে গেছে ব্রাণ্ড লাইন, সারাদিনে দুটো প্যাসেঞ্জার আপ ডাউন চলে। বিশাল স্টেশন-বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা পড়ে থাকে। বিনা-টিকিটের যাত্রী এত বেশী যে রেল কর্তৃপক্ষ এ লাইনটা তুলে দেওয়ার কথা ভাবছে। ওভারব্রীজের তত্ত্বা খুঁলে পড়ে যাচ্ছে, প্ল্যাটফর্মে ইন্ট বেরিয়ে আছে, ভিথিরির বাচ্চারা প্ল্যাটফর্মের ষেখানে সেখানে তাদের শরীরের ক্রাথ ফেলে রাখছে।

আমরা ট্রেন দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়লাম। সবসুখ্‌ জনা গ্রিশ চিল্লিশ লোক নামল! বয়সের মেয়েছেলে নেই, সাহেব আমলের বড়ো চেকার নিকলসন ঘাড় কাত করে গেট-এর কাছে দাঁড়িয়ে ভিথিরির মতো হাত বাড়িয়ে আছে। যে যার ইচ্ছেমতো সেই হাতখানা ঠেলে ঠেলে চলে যাচ্ছে, টিকিট কেউ দেয় না। নতুন লোক এলে নিকলসনকে দেখে একটু থমকাবেই, নীল চোখ, লাল চুল, সাদা রঙের আস্ত্র একটা সাহেব। কিন্তু সে নিজে তার সাহেবত্ব ভুলে গেছে কবে। আমাদের বিজয়কে দেখলে ভিজয়, ভিজয়, বলে ডাকাডাকি করে, বিজয়ের কোঁটো থেকে দুর্-তিন টিপ নসি়া নেয়। সাহেবী আমলে তার মেম-বৌ ছিল, সে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর নিকলসন তাদের নেপালী আয়াকে প্রমোশন দিয়ে বৌ করে রেখেছে। নেপালী আর ইংরিজিতে তাদের মাঝে মাঝে ধুন্দুমাঝ বগড়া হয়। নিকলসন সাহেব ঝিঙে, ঢেঁকির শাক সবই খায় আজকাল।

মেয়েছেলে দেখা গেল না। তিন-চারজন বেশ ভাল চেহারা আর পোশাকের লোক ওয়েটিং রুমের দিকে গেল। ব্রীজের তলায় ভিথিরিদের উনুনে নতুন কাঠ গুঁজে দিয়েছে। সেই ধোঁয়ায় চোখে জল এসে যাচ্ছিল।

হারু বলল—নিকলসন সাহেব আর বেশি দিন বাঁচবে না, বুদ্ধি! ওর বোধবুদ্ধি ভোঁতা হয়ে কেমন হয়ে গেছে।

—কেন? আমি জিজ্ঞেস করি।

হারু বলে—সেদিন ডাউন প্যাসেঞ্জারটা চলে যাওয়ার পর নিকলসন বেণ্ডটায় বসে বিড়ি ধরাবার সময় যেই নাথার হ্যাট খুলেছে, অর্মানি হ্যাটের ভিতর থেকে একটা বোলতা বেরিয়ে উড়ে গেল।

—যাঃ!

—মাইরি—মাইরি! নাথার চুল ছাঁটে না বলে ঝোপড়া হয়ে আছে মাথা, তাই কামড়ানি, কিন্তু টুপি়র ভিতর বোলতা উড়লে লোকে টের পাবে না! ও কিন্তু পায়নি। তাই বলছিলাম—

ডালিম প্ল্যাটফর্মের লোক দেখতে দেখতে হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাকল—আরে! মদন, এই, মদন—

আমরা সবাই ওভারব্রীজের রেলিঙ ধরে ঝুঁকে পড়লাম। নিকলসনের হাতটা ঠেলে মদন বেরিয়ে এল। বগলে একটা কাগজের প্যাকেট। মদুখ তুলে

আমাদের দেখে একটু ভ্রু কুঁচকে বলল—তোরা !

—খালাস পেলি ? আমি চোঁচিয়ে উঠেছিলাম, বাদ্দ আমাকে খোঁচা দিয়ে বলে—এই শালা খালাসের কথা চোঁচিয়ে বলতে আছে ? তুই একটা—অশ্লীল কথা দিয়ে বাকা শেষ করে বাদ্দ । তারপর ঝুঁকে বলে—উঠে আস না মদন ।

মদন একটু বিরক্ত চোখে আমাদের দেখল। একটু ইতস্তত করল, তারপর উঠে এল । তার মাথায় একটোকা চুল পিঙলে হরে জট বেঁধেছে, গায়ে বসাময়লা, হাত পায়ে গাঁট ফোলা ফোলা, খুব রোগাও হয়ে গেছে !

—কবে খালাস পেলি । হার্দু জিজ্ঞেস করে ।

মদন গম্ভীর গলায় বলে—কাল !

—খালাস না জামিন ? আমি জিজ্ঞেস করি ।

মদন গম্ভীরভাবে আমাব দিকে চেয়ে বলল—তোর বয়স আর বাড়ল না রণ্টে ! দুবছর হাজতে থাকার পরেও কেউ জামিন পায় ?

আমি আমতা আমতা করে বলি—কাগজে কেবল জামিনের কথাই পড়ি তো । শোনা যায়, পদ্বীশ সবাইকে ধরে নিয়ে জামিনে আবার ছেড়ে দেয়, তারপর আর ধরে না !

মদন একটু গবের সঙ্গে বলল—আমারটা ছিল আন বেইলেব্ল্ কেস !

কথাটার মানে তেমন পরিষ্কার বুঝলাম না, ইংরিজিতে আমি বরাবর কাঁচা ।

ডালিম জিজ্ঞেস করল—কেমন ছিল ?

মদনের চোখ চক্‌চক্ করে ওঠে ! একটু বাঙ্গের হাসি হেসে বলে—কেমন আর ! আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেমন হয়—বলতে বলতে সে নতুন লোকটার দিকে চেয়ে বলে—ইনি কে ?

ডালিম নীচু গলায় বলে—শ্রেণীহীন সমাজের লোক । বলে খুশখুশ করে হাসে ।

—তার মানে ? মদন একটু রুখে উঠে বলে । ‘শ্রেণীহীন সমাজ’ কথাটা বোধহয় তার ভাল লাগে না ।

নতুন লোকটা বলল—ঘাবড়াবেন না । ও একটা কথার কথা ।

মদন লোকটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলে—কথার কথা মানে কী ? ওসব কি ঠাট্টার কথা নাকি ? ঐ স্বপ্ন নিয়ে কত ছেলে লড়াই করে মরে যাচ্ছে !

লোকটা ঠাণ্ডা গলায় বলে—আসলে ইদানীং ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তরের সময়ে আমাদের মতো কিছু লোকের শ্রেণী লোপ পেয়েছে, ইংরিজি বলতে পারি, ক্রিকেট খেলা বৃদ্ধি, অচেনা জায়গায় ভিক্ষে করি, মছবের খবর পেলে বাই। বিষয়বাড়ি দেখলে সুট করে ঢুকে পড়ি । এসব অ্যাকটিভিটি থেকে একটা মানুষকে কোনো শ্রেণীতেই ফেলা যায় না । ভদ্রলোক, ছোটলোক, ভিথিরি—কোনোটাই খাটে না...

মদন একটু হাসল এতক্ষণে, বললে—সেই নিজের শ্রেণীকে ফিরে পাওয়ার

জনাই তো আমাদের লড়াই...বলতে বলতে ভুল বদ্বাতে পেরে মদন একটু থমকে গেল, তারপর আবার বলল—আসলে লড়াই শ্রেণীমুক্ত, শ্রেণীহীন সমাজের জন্য আমাদের লড়াই—

ডালিম জিজ্ঞেস করল—কার সঙ্গে ?

—কার সঙ্গে ! ভারী অবাক হয় মদন, তারপর কনুই চুলকোতে চুলকোতে বলে—আমলা আর শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে ।

হারদ্ব শ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল—তারা কারা ? কে আমলা, কে শ্রেণীশত্রু ? মদন রেল-ইয়ার্ডের দিকে অনামনস্ক ভাবে চেয়ে বলল—বাবা ।

আমরা চমকে উঠি । জিজ্ঞেস করি—তোরা বাবা শ্রেণীশত্রু ? আমলা ? মদন মাথা নেড়ে বলল—না । ঐ দেখ বাবা বাজার কবে ফিরছে ।

আমরা চেয়ে দেখি, মদনের বাবা হরিবাবু বাজারের বাগ হাতে লাইন পার হয়ে ফিরছেন । দূর থেকে তাঁকে একটা কাঁকড়ার মতো দেখাচ্ছে ।

মদন সেদিকে চেয়ে থেকে বলল—দুবছর বাদে বাবাকে দেখলাম । কী রোগা হয়ে গেছে দেখেছি !

আমাদের মন নরম হয়ে যাচ্ছিল । চুপ করে রইলাম ।

মদন একটা শ্বাস ফেলে মুখ তুলে আমাদের দিকে চেয়ে বলল—তোরা এখনো এইভাবে সময় নষ্ট করিস ! ওয়েটিং রুম আর ওভারব্রীজ ঘুরে ঘুরে জীবনটা কাটিয়ে দিলি । কত কিছুর করার ছিল তোদের । বলে আমাদের মুখে নে একটু ভর্তসনার চোখে তাকাল, বলল—আমি জেল থেকে এলাম, দ্যাখ, কত কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু এখানেই থামছি না । আবার যাবো জেল-এ । তারপরও আবার যাবো । এইভাবে একদিন জেলখানার দেয়াল ভেঙে পড়বে । ওরা যত মারবে আমাদের লড়াই তত ছড়িয়ে পড়বে...

বাধা দিয়ে ডালিম বলল—খুব কষ্ট দেয় জেল-এ ?

বড় বড় চোখে চেয়ে মদন বলল—দেবে না ! চুল ছাঁটিনি কত দিন, মাথায় উকুনের বাস, গায়ে চামড়ার নীচে একরকমের পোকা হয়েছে, ভীষণ চুলকায়, চাম পোকা বলে । গাঁটে গাঁটে ব্যথা ।

—খুব মারত ?

—জেল-এ মারধোর নিষেধ । কিন্তু আমরা ফাস্ট ক্লাশ প্রিজনারশিপের জন্য আন্দোলন করায় মারে, তারপর এনকোয়ারীর সময়ে ওপরওয়ালারা এলে ওরা রিপোর্ট দিল যে আমরা জেল থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিলাম, বলে মেরেছে । উঃ, যাই । এখন স্নান করব । বহরমপুর থেকে টানা এসেছি, রাতে ঘুম হয়নি । কতকাল দাঁত মার্জি না রে !

বলে মদন নেমে গেল ।

গাড়ি চলে গেছে । প্র্যাটফর্ম আবার ফাঁকা । আমি ভাবছিলাম, যদি মদনদের কুরোটাও বোমফাটা কুরো হয়ে থাকে আর ওর বাবা যদি জল মেপে থাকে

তবে মদনের আজ স্নান হবে কিনা ! আমি গভীরভাবে ব্যাপারটা ভাবতে থাকি । সবসময়েই আমার মাথায় অশুভত সব সমস্যার চিন্তা আসে ।

হারু অনির্দিষ্ট ভাবে জিজ্ঞেস করল—সিগারেট আছে ?

কেউ উত্তর দিল না, জানা কথা, নেই ।

গাড়ি চলে যাওয়ার পর নিকলসন প্র্যাটফর্মের বেষ্টিতে বসে টুপি খুলে ঘাড় গলার ধাম মোছে । তারপর একটু ঝিমোয় । আজও ঝিমোচ্ছে ।

হারু উঠে বলল—হাই, নিকলসনের কাছে একটা বিড়ি পাই কিনা দেখি ।

আন্ত এবং খাঁটি একটা সাহেব কাছে-পিঠে থাকলে অনেক সুবিধে । বিশেষ করে ইংরিজির ব্যাপারে । হারু এখনো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড রিনিউ করে । দু-একটা ইন্টারভিউও পায় । সেইজন্যই ইংরিজিটা ব্যালিয়ে রাখে । নিকলসনের সঙ্গে সে সব সময়ে ইংরিজিই বলে । অবশ্য এমনিতেই দরকার হয় না, সাহেব ভাঙা বাংলা হিন্দি নেপালী দিবা বলে ।

হারু দূর থেকেই বলল—গট্ বিড়ি হেঃ নিকলসন ?

নিকলসন চোখ খুলে ফোকলা হাসি হাসল, তারপর বলল নাও, গট্ খৈনী আন্ড চুন ট্রাই ?

হারু একটু অবাক হয়ে বলে—খৈনী কবে থেকে সাহেব ? বলেই আবার ইংরিজি করে বলে—খৈনী ফ্রম হোয়েন নিকলসন ? —আঃ ও । বলে নিকলসন একটা শ্বাস ফেলে পকেট থেকে লম্বা দুমুখো কোটো বার করে, তার এক মুখে চুগ, অন্য মুখে তামাক পাতা, পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে—রিসেন্টলি, ট্রাই ? ভেরী চীপ । আই গ্যাটেন এ হান্চ্ ফর ইট সিন্স লঙ্ ডিডনট ট্রাই । বাট ইটস নাইস ।

হারু খৈনীর জন্য হাত বাড়ায় ।

ডালিম আর বাদু উত্তর দিকে মুখ করে সবচেয়ে দূরে কে থুথু ফেলাতে পারে তার কর্মপিটিশন দিচ্ছে । বাজী কুড়িটা কাঠি । নতুন লোকটা চোখ বুজে রেলিঙে হেলান দিয়ে বসে । আমি হারুর খৈনী খাওয়া দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে বললাম—আমার জন্য একটু আনিস হারু ।

সে কথার শব্দে নতুন লোকটা চোখ খুলে বলল—একটা কথা শুনছেন ?

—কী ?

—উত্তরের মতো দক্ষিণেও একটা জংশন হবে ।

—জানি ।

লোকটা শ্বাস ফেলে বলল—দক্ষিণের জংশন উত্তরের চেয়ে পাঁচগুণ বড় হবে । আর তখন উত্তরের জংশনটা আমাদের এই স্টেশনের মতোই ফাঁকা পড়ে থাকবে ।

—জানি ।

—হাই জানেন ! লোকটা খমকায় । তারপর আবার আপনমনে বলল—

দক্ষিণের জংশনটা হবে পৃথিবীর চতুর্দশ বৃহত্তম জংশন, ভারতের বৃহত্তম। রেলমন্ত্রী বলেছেন যে, ভারত ওখানেই থেমে থাকবে না। এরপর পূর্বদিকে যে জংশনটা হবে সেটা হবে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম, তারপর আবার তারা প্ল্যান পাচ্ছিলেন। তখন পশ্চিমে হবে বিশ্বের বৃহত্তম জংশন। এইভাবেই ভারত তার পুরোনো প্রকল্প ছেড়ে বৃহত্তর নতুন প্রকল্প এবং ক্রমে বৃহত্তম প্রকল্প-গুলির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম—যাঃ।

লোকটা চোখ ছোটো করে আমার দিকে চেয়ে বলল—যাঃ বলবেন না। আপনি অনেক কিছুই জানেন না! যেমন আজ সকাল পর্যন্ত আপনি জানতেন না যে টিকিটকি জল খায় না।

খুব লজ্জিত হয়ে পড়ি। বাস্তবিক, আমার জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ।

লোকটা বলে—ক্রমশঃ বিশ্বের বৃহত্তম প্রকল্প রচনায় ভারত রেকর্ড সৃষ্টি করতে যাচ্ছে বুদ্ধলেন?

আমি মাথা নাড়ি।

লোকটা বলে—যখন একের পর এক জংশন শেষ হবে তখন আলটিমেটল দেখবেন পশ্চিমের বৃহত্তম জংশন ছাড়া অন্য তিনটি জংশনই মাইনর স্টেশন হয়ে গেছে। এবং সে সব স্টেশনের ওয়েটিং রুমগুলো আমরা ক্রমে দখল করে নেবো। ওয়েটিং রুম দখলের লড়াইয়ে আমরা জিতবোই। অবশ্য ততদিনে আমাদের মতো শ্রেণীহীন সমাজের লোকও অনেক বেড়ে যাবে, আরো বেশী বেশী ওয়েটিং রুম দরকার হবে তখন। সেই ওয়েটিং রুমগুলো হবে শ্রেণীহীন সমাজের মৃত্যুগুপ্ত।

খুঁখু ফেলার ডালিমের কাছে হেরে গিয়ে বাদু দশটা কাঠি দিয়ে দিল আর দশটা বাকী রাখল। কাল দিয়ে দেব। মধু ঘুরিয়ে নতুন লোকটাকে বলল আপনি আমার ইয়ে জানেন। লোকটা বলে—পরিষ্কার করে বলুন। বাদু সবজান্তার মতো বলে—দক্ষিণে জংশন হবে ঠিকই। তবে উত্তরেরটার সঙ্গে দক্ষিণেরটার যোগাযোগ হবে আমাদের এই স্টেশনের ভিতর দিয়ে। তখন এই স্টেশন দিয়েও মেল ট্রেন যাবে। তিনটে স্টেশনই তখন ইম্পোর্ট্যান্ট হয়ে উঠবে।

নিকলসন সাহেবের টুপি়র ভিতরের বোল্‌তাটার মতোই আমার মাথার মধ্যে একটা সমস্যার চিন্তা বোঁ করে ডেকে চক্কর দিতে থাকে। আমি ভীষণ উদ্ভিগ্ন হয়ে বলি—তাহলে ওয়েটিং রুমটার কী হবে?

বাদু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে—আবার সেগুন বা মেহগনির চেয়ার-টেবিল আসবে, সুইং ডোরটা সারানো হবে, জায়গায় নতুন কেয়ারটেকার আসবে। তখন দেখাবি, সুন্দর মান্দুস আর মেয়ে মান্দুস গাড়ি থেকে নেবে আমাদের ওয়েটিং রুমে দৃদৃশ্য জিরিয়ে যাবে।

লোকটা একটু হাসল। তারপর বলল—বাদ্দুবাদ্দ, তার চেয়ে বলুন না পৃথিবীটা আবার পিছিয়ে যাবে, ইংরেজরা ফিরে আসবে, নিকলসন মেমসাহেব নিয়ে ঘর করবে—

বাদ্দু লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে। খুব রাগের চোখ।

লোকটা ঠাণ্ডা গলায় বলে—আপনি যা বলেছেন তা হল পঞ্চাদশসংখ্যক কথা। আমি যা বলছি তা প্রগতির কথা। আমার কথাই ঠিক হবে, কারণ ভারত এখন প্রগতির হেলিক্সে উঠে পড়েছে, নামবার উপায় নেই, চেন টানলে আড়াই শো টাকা জরিমানা। তাকে যেতেই হবে। অতএব আগামী পাঁচবছরের মধ্যেই আমরা আরো তিন তিনটে ওয়েটিং রুম পেয়ে যাচ্ছি।

মনে মনে আমি নতুন লোকটাকেই সমর্থন করতে থাকি। আমার মনে হয় লোকটাই ঠিক বলেছে। মনে মনে তাকে আমি ভীষণ সমর্থন করি, মনে মনেই পিঠ চাপড়ে দিই। বাদ্দুর ভয়ে মুখে কিছু বলি না।

বাদ্দু জিজ্ঞেস করল—আপনি ইয়াকি করছেন?

লোকটা প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে ছিল। প্ল্যাটফর্মের বেণ্ড-এ পাশাপাশি বসে হারুন নিকলসনের সঙ্গে প্রাণপণে ইংরিজিতে কথা বলেছে। দুজনেরই ঠোঁটের নীচে খৈনির ঢিপি। সেই দিকে চেয়ে লোকটা বলল—সাহেবটা একেবারে হারভাস জিলার লোক হয়ে গেল, দেখছেন? আজকাল খুব চ্যাবনপ্রাশ খায়! কার কাছে শুনছে, চ্যাবনপ্রাশে যৌবনোচিত শক্তি বাড়ে।

বাদ্দু বলে—ওর মেম-বউকে নাকি রেল কোম্পানী এখনো ওর মাইনে থেকে কেটে মাসোহারা পাঠায়।

ডালিম অবাক হয়ে বলে—সে তো বিলেতে! বিলেতে কি ইন্ডিয়ান টাকা পাঠানো যায়? আইনত পারে না।

—বিলেত না আমার ইয়ে। বলে বাদ্দু—ওর বউ কানপুরে এক সাহেব মূচীকে বিয়ে করে সেখানেই আছে। বিয়ে করলে মাসোহারা পায় না।

আমি অবাক হয়ে বলি—তাহলে সাহেব খৈনী খায় কেন?

বাদ্দু আমাকে পাগল-দেখাব মতো দেখে বলে—খৈনির সঙ্গে ওর মেম-বউয়ের কী সম্পর্ক?

আমার এইটাই হচ্ছে মূর্খশিল্প। মনের মধ্যে এমন সব চিন্তা আসে, এমনই জটিল সে সব চিন্তা যে হঠাৎ সেই চিন্তার কথা বলে ফেললে লোকে ঠিক বুদ্ধিতে পারে না। পাগল কিংবা বোকা ভাবে। আসলে আমি ভাবছিলাম, বউকে মাসোহারা পাঠাতে না হলে নিকলসনের বেশ কিছু টাকা নিশ্চয়ই বেঁচে যায়। অন্তত বিড়িটা তো ম্যানেজ হয়ই।

একমাত্র নতুন লোকটাই আমার কথা বুদ্ধিতে পারল বলে মনে হল। সে আমার দিকে চেয়ে বলে—ঠিকই বলেছেন রস্টেবাবু। ব্রিটিশ আমলে যখন ও কন্ন মাইনে পেত তখন ও মেম বউ পুষত, গোল্ড ফ্লেক সিগারেটও খেত। গত

পাঁচিশ বছর ধরে একটানা চেকারের চাকরি। মাইনে নিশ্চয়ই ওর আন্দাজে ভালই এবং ব্রিটিশ আমলের চেয়ে বেশীই পায়, তবু ব্র্যান্ড পাণ্টে বিড়ি হয়ে খৈনী পৌঁছে গেছে। কিন্তু খৈনীর পরে কী? হোয়াট নেক্‌স্ট? সেইটাই সমস্যা, বলে লোকটা গভীর চিন্তা করতে থাকে।

আমি লোকটাকে ভাবতে দিয়ে আবার টিকিটিকদের কথা ভাবি। জল খায় না? টিকিটিক সতিাই জল খায় না?

ডালিম হাই তুলে বলে—হেঁদো কথার কী হবে? মোটে সাড়ে দশটা বাজে, লম্বা দুপদুর পড়ে আছে। রস্টে, ওয়েটিং রুমটার কী হবে? একবার মতের কাছে খোঁজ নিয়ে আস না!

ওয়েটিং রুমের কথায় নতুন লোকটা ধান ভেঙে তাকায়। তারপর আমাকে চূড়ান্ত সঙ্গান দিয়ে আমাকেই বলে—রস্টে যাবু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন?

লোকটার স্ত্রানের কাছে আমি কমেই বিকিয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে উৎসুক হয়ে বলি—কী?

ওয়েটিং রুমটা আমরা পেরেছি বটে, কিন্তু বাথরুমটা পাইনি। ওটা এখনো মতে তালো দিয়ে রাখা।

আমরা সতটা উপলব্ধি করতে থাকি। মাঝখানে বাদু বলে—মতে খুলে দেয় না যে, কী করব?

লোকটা চোখ ছোট করে বলে—তা হলে বলতেই হয় যে, আপনাদের জন্ম সম্পূর্ণ হয়নি। বাথরুমটা তালো দিয়ে রাখা। কিন্তু চূড়ান্ত অপমান।

বলতে কি, এই ব্যাপারটা আমাদের বিশেষত আমার মাথায় কোনোদিনই আসেনি। ওয়েটিং রুমে বসবার অধিকার পেয়ে আমরা আনন্দে এতই আত্মহারা হয়ে যাই যে বাথরুমটার তালার কথা মনেই হয়নি। আমরা যা পেরেছি সেটার বিস্ময়ের ঘোরই এখনো কাটেনি। কিন্তু লোকটার কথায় আমার বৃকের মধ্যে একটা বিদ্রোহ ছড়িয়ে গেল। বস্তুত একটু আগে জেল ফেরত মদনের কাছে সংগ্রাম এবং লড়াইয়ের কথা শুনে আমার ভিতরটা তেতেই ছিল। আমি ঝাঁকি দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—মতের এটা ভারি অন্যায়।

নতুন লোকটা হাসল। ঠান্ডা গলায় নিকলসনের মতো ইংরেজিতে বলল—দ্যাটস দ্য স্পিরিট।

আমি সিঁড়ি ভেঙে উত্তেজিতভাবে নেমে যাচ্ছিলাম। ডালিম ডেকে বলল—রস্টে, বেশী মেজাজ দেখাসনি মতের সঙ্গে। বের করে দেবে। আজকাল দুপদুরে কাঁঠাল পাকানো গরম পড়ে, শহরের আর কোথাও অমন মাগনা বসতে দেবে না—এ সব মনে রাখিস।

মতে ওয়েটিং রুমের দরজার সামনেই বশব্দ দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে চোখের ইশারায় ধমকালো দূর থেকে। অর্থাৎ ভিতরে এখনো মেহমান আছে। তারপর কাছে এসে নীচু গলায় বলল—এখন চলে যান।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—কারা এসেছে ?

—চা বাগানের বড় বড় সাহেব সব । বাগান থেকে গাড়ি এসে নিয়ে যাবে, তাই ইনতেজার করছে । চলে গেলে আমি আপনাদের ডেকে দেবো ।

আমাব ভিতরের সংগ্রামী মনোভাব তখন অর্ধেক হয়ে এসেছে । কাছে পিঠে যদি এখন লোক থাকে যে খুব বড় অফিসার, কিংবা খুব শিক্ষিত বা খুব বড়লোক তা হলেই আমার ভিতরটা কেমন যেন ভয় ভয় ভাবে ভরে ওঠে ।

তবু আমি সাহস করে বললাম—মতে, তুমি আমাদের বাথরুমটা খুলে দাও না কেন ?

বাথরুম ! বলে মতে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দেখে আমাকে । তারপর বলে—বাথরুম দিয়ে কি হোবে ?

আমি রাগ করে বলি—বাথরুম দিয়ে কি হয় তুমি জানো না ?

মতে বুদ্ধদায়ের মতো মাথা নেড়ে বলে—পেসাব করবেন তো ! সে তো আনেক জায়গা আছে । স্টেশনভর তো পেসাবেরই জায়গা, কত লোক করে যায় । বেগ পেলে লাইনের ধারে এসে ছেড়ে দেবেন । পিলাটফরম থেকে নামতেও হবে না । মালগদুদামের পিছনে টাটি ভি করতে পারেন । ওদিকের পুকুরে জল ভি আছে ।

আমি পয়েন্ট খুঁজে পায় না । তার কথায় প্রায় সায় দিয়ে ফেলি আর কি ? তবু কাঁইমাই করে একটা পয়েন্ট খুঁজে পেয়ে বললাম—পুকুরটার জল তো নোংরা !

মতে উদার গলায় বলল—নোংরা আবার কি ? কয়েকটা ভৈঁস বসে থাকে বলে একটু ধোলা । জল-খরচে ওর চেয়ে ভাল জল দিয়ে কি হোবে ?

হতাশ হয়ে আমি ফিরে আসি ।

—কী হল ? ডালিম জিজ্ঞেস করে ।

—বাথরুম খুলে দেবে না ।

—ঘরটা ?

—বাগানের সাহেবরা আছে, তারা গেলে ডেকে দেবে ।

সবাই অপেক্ষা করতে থাকি । এগারোটা বাজতে চলল । বাতাস তেতে উঠছে, খুলো উড়ছে ! সিঁড়ির নীচে ভিখিরিরা নাড়িভুড়ি সেম্ব করে নামিয়ে একগাদা তরকারীর খোসা সেম্ব চাপিয়েছে । প্র্যাটফর্মের বেঞ্চে ঘুঁমিয়ে পড়েছে নিকলসন সাহেব, হাঁ-মুখ থেকে একটা বড় নীল মাছি বেরিয়ে এল । হারু অনেকটা তামাক পাতা নিয়ে এসেছে আর চুন ।

সকলের পকেটেই এবটা দুটো লুকোনো সিগারেট আছে । কেউ তা বের করে না । যে বের করবে সে পাবে প্রথম পাঁচ টান, বাকী সবাই তিন টান করে । তাই সবাই চেপে যায় । আমি হাত বাড়িয়ে খেঁচি নই । ঠোঁটে টিপে থুথু ফেলতে থাকি । নতুন লোকটা চোখ বুলুজ়ে আছে । নতুন কিছু ভাবছে নিশ্চয়ই ।

লোকটা জানে অনেক ।

ডালিম বলল—বাথরুমটা পেলো দুদিন বাদে স্নানটা হত ।

লোকটা আবার চোখ খোলে । আমি উৎসুকভাবে তাকাই ।

লোকটা বলে—রশ্টেবাবু কোনো কাজের নয় । বাথরুমটা আমরা পাবোই । পেতেই হবে ।

আমি একটু অপমানিত বোধ করলেও চেপে গেলাম । আগামী কয়েক বছরের মধ্যে যদি আরো তিনটে ওয়েটিং রুম আমাদের দখলে আসে তবে কি তখনো বাথরুমে তালা দেওয়া থাকবে ? এই সমস্যাটা আমাকে ভাবিয়ে তোলে ।

অনেকক্ষণ বাদে মতে এসে নীচে থেকে ডাকল—যান সব । ঘর খালাস হয়েছে । বকশিশ যেন মনে থাকে ।

নতুন লোকটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠেই আমাদের সংগ্রামে ডাক দেয়—উঠুন, ওকে ছেড়ে দেওয়া যায় না । সরকারী ওয়েটিং রুমে বসতে দেয়, তাতে তো ওর বাবার টাকা খরচ হয় না । ওসব সামান্য খাতিরে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না । বাথরুম ওকে খুলে দিতে হবে ।

আমরা গিয়ে মতেকে ধরি ।

—বাথরুম খুলে দাও । দিতেই হবে ।

আমাদের মারমুখো মুখের দিকে চেয়ে একটু খতিয়ে যায় । বলে বাথরুম খুলে দিলে তো আপনারা নোংরা করবেন ! আমি বড়ো হয়েছি, হাতে বাত, ধোলাই করতে আমার জান বেরিয়ে যায় ।

আমরা অনেক পরেন্ট পেয়ে যাই । নতুন লোকটা বলে—ধরো যদি এই স্টেশন আগের মতোই হত, রোজ প্যাসেঞ্জার নামত তা হলে তো রোজই তোমাকে ধোলাই করতে হত । তখন কী করতে ?

মতে গভীর এবং করুণ মুখে বলে—সে দিন তো এখন নাই । এখন একটু সুখে আছি, আপনারা দিবেন না ?

লোকটা সরকারী কর্মচারীদের গ্যাফিলতির কথা তোলে । নেহরুর একটা কোটেশন দেয় এবং ভবিষ্যতে স্টেশনগুলোর ওয়েটিং রুম দখলে শ্রেণীহীন সমাজের সংগ্রামী ভূমিকার ভয়ও দেখায় । মতে ক্রমশ পরেন্ট লুজ করতে থাকে । শেষদিকে কেবল নিজের বড়ো বয়সের অক্ষমতার উল্লেখ ছাড়া আর কোনো জোরালো পরেন্ট দিতে পারে না । তখন মোক্ষম অস্টটি ছাড়ে লোকটা, বলে—তোমার বয়স কম করে সত্তর ।

মতে ভয় পেয়ে গিয়ে বলে—না, না ঐ নিকেলসন সাহেবের উমর কেবল পঁচাত্তর । ঐ চোটা সাহেবটা ছাড়া আর আমরা কেউ এই স্টেশনের কোনো গভার্মেন্টের লোক উমর ছিপাইনি ।

নতুন লোকটা কিন্তু চুড়ান্ত জয়ের মুখোমুখি এসে গেছে । আমরা বদ্বাক্তে

পারি। এবং চারিদিক থেকে হই হই করে উঠি। মতে ঘাবড়ে যায়। তারপর সত্তর বছর বয়েসের পক্ষে অত্যন্ত সাদা এবং সুন্দর দাঁত দেখিয়ে সে হেসে ফেলে বলে—ঠিক আছে মাঝে মধ্যে বিড়িটা সিগারেটটা দিবেন, চা পানির পরসা দিবেন, বাথরুম খুলে দিচ্ছি।

দুর্দিন বাদে স্নান করে ডালিম খুব খুশী। হারদকে গা শর্দকিয়ে বলল—
দ্যাখ তো আর সেই চাম্‌সে গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে?

—না। হারদ শর্দকে বলল!

সবাই স্নান করলাম। ওপর থেকে ঝাঁঝির দিয়ে কী মিঠে ঠান্ডা ঝরঝরে জল যে পড়ল। ঘুম পেয়ে গেল। স্নানের পর বেশ ভালই দেখাতে লাগল আমাদের। তার সঙ্গে একটা লড়াই জেতার আনন্দ।

নতুন লোকটা আবার ডেক চেয়ারে বসেছে, পশ্চাদেশ ঝুলে আছে ফুটো দিয়ে। টেবিলে আমরা চারজন। তাসগলো আবার বাঁটা হচ্ছে। পিছন থেকেই তাসগলো চেনা যায়। কিন্তু সামনে আরো অনেক দূপদূর পড়ে আছে, আরো অনেক দিন। আমাদের কিছু করার নেই।

বাজে তাস পেয়ে আমি তাস ফেলে দিলাম। টিকটিক কেন জল খায় না তা আবার গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম। আশ্চর্য এই যে প্রতিদিনই এরকম নতুন কিছু না কিছু ভাববার জিনিস ঠিক পাওয়া যায়।

তিন টুকরো গল্প

১. ঘুম

গোবিন্দর পিছনে যে গোয়েন্দা লেগেছে তা বদ্বতে তার কয়েকদিন সময় লাগল। আসলে লোকটাকে বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখে প্রথমে তাকে গোয়েন্দা বলে সন্দেহই হয়নি। লোকটির চেহারা বেশ শক্তপোক্ত, রক্ষ, রাগী-রাগী, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, দাড়ি প্রায়ই কামানো থাকে না, পরনে সাধারণ জামা আর প্যান্ট। সে আড়ে আড়ে বাড়ির ওপর নজর রাখে, চোখাচোখি হলে চোখ সারিয়ে নেয়, তবে পালায় না।

প্রথমে গোবিন্দর সন্দেহ হল, লোকটা তার বউয়ের গদুপ্ত প্রণয়ী বা জার। তাই সে একদিন খুব সাহস সঙ্গয় করে বউ শাশ্বতীকে ডেকে বলল, লোকটা কে?

শাশ্বতী মেদ কমানোর জন্য ব্যায়াম করছে, নাচ শিখছে। সুফলও ফলেছে। আজকাল তাকে বেশ ছুঁকরি-ছুঁকরি লাগে। প্রাক করা ব্রু ওপরে তুলে চরম বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, কোন লোকটা গো?

ওই যে, ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায়ই ওকে আনাচে কানাচে দেখি ও তোমার ইয়ে টিয়ে নয় তো!

শাশ্বতী জানালায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ফটকের পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে তার স্টেপ কাট করা চুল ঝামরে বলল, কখনো নয়। ও মা, এসব আবার কী কথা তোমার মূখে! লোকটাকে তো আমি চিনিই না।

এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া শুরু হল। সেই ঝগড়া চলল তিন দিন। তারপর মান অভিমান, কাম্বাকাটি। শাশ্বতী অবশেষে বলল সে একমাত্র তার ব্যায়ামশিক্ষক জগদা ছাড়া আর কোনও লোককেই তার যোগ্য প্রণয়ী বলে মনে করে না।

এ কথা শুনে গোবিন্দ একটু নিশ্চিত হল বটে, কিন্তু সন্দেহ গিয়ে পড়ল বড় মেয়ে পিয়ালীর ওপর। লোকটা পিয়ালীর প্রেমিক নয় তো!

কথাটা একদিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুলতেই পিয়ালী গভীর মুখ করে বলল, হাবুদা ছাড়া আমার জীবনে আর কোনও—

গোবিন্দ খানিকটা স্বস্তি বোধ করল বটে, কিন্তু লোকটা তাহলে কে এই প্রশ্নটা কেরোসিনের গন্ধের মতো চারপাশের বাতাসে লেগেই রইল।

তবে কি গোয়েন্দা? বলতে কি গোবিন্দের ওপর গোয়েন্দাদের নজর পড়া

মোটাই অস্বাভাবিক নয়। গোবিন্দ যে ইদানীং শাঁসালো হয়ে উঠছে তা বহু চেষ্টা করেও গোপন রাখা যাচ্ছে না।

গোবিন্দ শূরু করেছিল একেবারে শূরু থেকে অর্থাৎ 'কিছু না' থেকে। তারপর ধীরে ধীরে তার উন্নতি ঘটেছে এবং এখনও ঘটেই চলেছে। একবার উন্নতি শূরু হলে তাকে ঠেকায় কার সাধ্য! কিন্তু গোবিন্দ বোকা নয়। সে তার উন্নতিকে যথেষ্ট সাবধানে এবং বিস্তর চেষ্টায় গোপন রাখে। সে তার নতুন জামায় তালি লাগিয়ে নেয়। ছেঁড়া জুতো পরে, পদ্রনো ছাতা ব্যবহার করে, দু'দিন পর পর দাড়ি কামায় ইত্যাদি। সে তার বাড়টাকে ইচ্ছে করেই সম্পূর্ণ করেনি, একটু শ্রীহৃদহীন করে রেখেছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তার আট দশটা লকার আছে, বাড়িতে মাটির নীচে আছে গুপ্ত কুঠুরী। কিন্তু সেগুদিলিতে সামান্যই সোনাদানা আছে তার। তার যত টাকা সবই নানা কারবারে উৎপাদনে, খণপত্রে লগ্নী করা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, গোবিন্দ যখন খুব গরিব ছিল তখন সে দেখেছে যে দারিদ্র্য জিনিসটাকে কিছুতেই ঢাকাচাপা দিয়ে রাখা যায় না। নানা ফাঁক-ফোকর দিয়ে দারিদ্র্য প্রকাশ হয়ে পড়েই এবং পাঁচজনকে জানান দেয় যে, এই লোকটা আসলে গরীব। মাছ দিয়ে শাক ঢাকছে। আবার সম্পদ জিনিসটাও ঠিক তাই, যতই চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা যাক না কেন, নানা ফাঁক-ফোকর দিয়ে সম্পদ উঁকি মারবেই এবং পাঁচজনকে জানান দেবে যে, এই লোকটা আসলে শাঁসালো। শাক দিয়ে মাছ ঢাকছে।

গোবিন্দর বউ লোক-দেখানো গয়না পরেন বটে, কিন্তু তাঁর বাঁ হাতের অনামিকায় যে হীরের আংটিটা আছে তার দাম ত্রিশ হাজার টাকা। আর ব্যায়ামের শিক্ষক আর নাচের গুরু মাসে পাঁচশ টাকা করে নেয়। বিউটি পারলারেও নিশ্চই মোটা খরচ হয়, তার রেট গোবিন্দও অবশ্য জানে না। সে নিজে তালি দেওয়া জামা আর তালি দেওয়া জুতো পরলেও তার ছেলেমেয়ে বাজারের সেরা জামা জুতো পাবে, সেরা স্কুলে পড়তে যাবে এবং প্রত্যেকের আবার প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা গৃহশিক্ষক বা শিক্ষিকা আছেন, যাঁরা কেউ পাঁচশো টাকার কম নেন না! যাট সত্তর টাকা থেকে দেড়শো টাকা কিলোগ্রামের মাছ তারা ফেলে ছাড়িয়ে প্রতিদিন খায়। এসব কি আর গোপন থাকে?

সম্পদ হল নতুন-প্রেম-পড়া কিশোরীর মতো, সারাক্ষণ ফাঁক-ফোকর দিয়ে উঁকি ঝুঁকি দেয়। আর তখন ওই গোয়েন্দাটার সঙ্গে কি আর চোখাচোখি হয় না তার?

লোকটা যে গোবিন্দের ওপর নজর রাখছে তা সে গোপনও করছে না তেমন। এবং লোকই তার সম্বন্ধে কী ভাবছে তা আন্দাজ করতেই গোবিন্দর ভীষণ লজ্জা হয়। ভয় তো আছেই।

গোবিন্দ যতই গরিব সেজে থাকুক তার হাতখাড়টার দাম চার হাজার।

টাকা। সেদিন বেরোবার সময় গোবিন্দ লক্ষ্য করল, লোকটা ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে আড়চোখে তার ঘড়টাকে নজর করছে। গোবিন্দর বুকটা কেঁপে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ঘড়টা কানের কাছে তুলে একটু ঝাঁকিয়ে শোনার ভান করে স্বগতোক্তি করল, এ বন্ধ হয়ে গেছে। হবে না। আশি টাকার সস্তা ঘড়ি আর কদিন চলবে।

শাশ্বতী যথেষ্টই সুন্দরী। ইদানীং ব্যায়াম করে আর নেচে আরও সুন্দরী হয়েছে। খজনা পাখির মতো শরীর। রাস্তায় বেরোলে পাঁচজনে তাকায় এবং তারিয়ে তারিয়ে দেখে। কিন্তু নিলঞ্জ গোয়েন্দাটা শাশ্বতীকে না দেখে বাঁ হাতের একরত্তি হীরের আংটিটার দিকে ডাব ডাব কবে তাকিয়ে থাকে।

বাজারে গিয়ে মাছ বা অসময়ের দামী ফুলকপি কিনতে গিয়ে গোবিন্দ প্রায়ই টের পায় গোয়েন্দা তার ঘাড়ের শ্বাসফেলার মতো দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটা সি বি আই না ইনকাম ট্যাক্স না অ্যান্টি করাপশন না আর কিছু তা বন্ধুতে পারছে না গোবিন্দ। কিন্তু অবস্থাটা যে চলতে দেওয়া যায় না তা সে বেশ বন্ধুতে পারছে। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।

গোবিন্দ তরু তরুে রইল। আর একদিন শীতের রাতে গলির মধ্যে লোকটাকে একা পেয়ে গেল। লোকটা একটু আনমনা ছিল সেদিন। আকাশের চাঁদ দেখাছিল।

গোবিন্দ খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে বিগলিত গলায় ডাকল, স্যার ?

অ্যা ?

আপনি কি ঘৃষ খান ?

লোকটা একেবারে আঁতকে উঠে গোবিন্দর দিকে বাকাহারা হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল।

কী বললেন ?

গোবিন্দ হাসিটাকে বিগলিত করে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, আজ্ঞে জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনি কি ঘৃষ খান ?

লোকটা কথা শুনে নববধূর মতো মাথা নত করে ফেলল লজ্জায়। তারপর অতিশয় লাজুক হাসি হাসতে হাসতে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে প্রায় ফুল-শয্যার রাতের নববধূর মতোই ফিসফিস করে বলল, খাই।

আজ্ঞে এখন কি খাবেন ?

লোকটা লজ্জায় চোখ তুলতে পারল না। তবে খুবই অনুরাগে ভরা গলায় বলল, পেলেই খাই। কেউ তো দেয় না স্যার।

গোবিন্দ তৈরিই ছিল। পকেটে হাত ভরে দশ টাকার একখানা নোট বের করে লোকটার লাজুক হাতে ধরিয়ে একেবারে আদর করে মৃষ্টি পাکیয়ে দিল।

লোকটা নববধূর মতোই প্রথম পদ্রুপ্পর্শের লজ্জাতেই যেন চট করে হাতটা টেনে নিয়ে প্যাণ্টের পকেটে পুরল। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, এর

অবশ্য তেমন দরকার ছিল না স্যার ।

গোবিন্দ গাড়ি স্বরে বলল, দু'নিরাটা টিকে আছে তো এই পরস্পরকে দেখার মধ্যেই । আপনি আমাকে দেখবেন, আমি আপনাকে ।

বড় ভাল কথা স্যার, বাড়ি গিয়ে খাতায় টুকে রাখব । মহাপুরুষদের বাণী নোট করে রাখা আমার হবি স্যার ।

ঠাট্টা করছেন স্যার ? মহাপুরুষ আর হতে পারলুম কই ? আমি তো কাপুরুষ । রেটটা বোধ হয় একটু কম হয়ে গেল স্যার । গরিব মানুষ আমি, নুন আনতে পাস্তা ফুরায় । তার ওপর আপনিই তো শৃঙ্খল নন, আপনার ওপরওলা সাহেবরা আছেন, তার ওপর কর্তারা আছেন, তার ওপর খোদ কর্তারা আছেন, তাঁদেরও খুশি করতে হবে । তা কটা বাজে বলতে পারেন স্যার ? ঘড়িটা কখন থেকে বন্ধ হয়ে আছে ।

আজ্ঞে এই দশটা । আপনার সব কথাই আমি খাতায় টুকে রাখব স্যার । একসঙ্গে এত ভাল ভাল কথা বহুকাল শুনিনি ।

আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না । রাতও হয়েছে । শীতের রাতে খাবার বড় তাড়াতাড়ি জুড়োয় ।

লোকটা বিরহের দৃষ্টিতে একবার গোবিন্দর দিকে চেয়ে চলে গেল ।

দু'দিন পর ফের দেখা । রাতের গলিতে । এবার লোকটাই ডাকল, স্যার ।

গোবিন্দ একটু থমকে বিগলিত হাস্যে মুখ ভরিয়ে ফেল বলল, ভাল আছেন তো স্যার ?

আপনার আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে । বলছিলেন কি, আমি কিন্তু ঘর খাই স্যার । এখন পেলো খাই—

গোবিন্দ খুব বিজ্ঞের মতো হাসল । প্রথম দিন থেকে সে রেটটা কম রেখে দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছে, মাঝে মাঝে দশটা টাকা দিতে এমন কিছু গায়ে লাগে না । একশ টাকা হলে লাগত । ফের দশটা টাকা লোকটার লাজুক মৃষ্টির মধ্যে ভরে দিয়ে সে বলল, আরে তাতে কি, খাওয়াই তো দু'নিরায় সব । এই যে বাড়ি ফিরে গিয়ে মোটা চালের ঠাণ্ডা ভাত আর জলের মতো একটু ডাল, কালো মতো একটা ছেঁচকি কয়েক ফোঁটা চোখের জল মিশিয়ে গিলব স্যার, তার মধ্যেও একটা সুক্কম আনন্দ আছে ।

এ কথাটাই যা বলেছেন, আর কোনও শালার মহাপুরুষ বলতে পারেননি । ডট পেনটার রিফিল ফুরিয়ে না গেলে আজই গিয়ে লিখে ফেলতাম ।

লোকটাকে নিজের পকেটের দামী ডট পেনটা উদারভাবে দিয়ে গোবিন্দ একটু হাসল, বলল, কি সব ছাতামাথা বলি, তবু যদি লিখে রাখবার ইচ্ছে হয় স্যার তো লিখবেন । তবে রিপোর্টটা একটু গরিবের দিকে টেনে লিখবেন স্যার । আপনার ডট পেনের রিফিল আমি কখনও ফুরোতে দেবো না ।

লোকটা চলে গেল, দু' চার দিন পর আবার এল ।

স্যার ।

স্যার ।

কী যে নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন স্যার, আর ছাড়তে পারছি না ।

কিসের নেশা স্যার ?

আজ্ঞে ঘুঘের, ঘুঘ না খেলে কেমন যেন শরীরটা ঘুঘঘুঘ করে । আইটাই করে, ছাই ওঠে, ঘুম পায়, দুঃস্বপ্ন দেখা দেয়, কী নেই কী নেই মনে হয় । ওফ, জ্বর নেশা বটে । তিন দিন হল ঘুঘ খাইনি স্যার, দেখুন কেমন দাঁড়ি পাকিয়ে গেছি ।

আহা ! আগে বলতে হয় । এই যে—বলে ফের দশটা টাকা তার কুশিষ্ঠ মৃতিতে ভরে দেয় গোবিন্দ । তারপর বলে, আচ্ছা আপনি কি সি বি আই ?

আজ্ঞে না ।

তবে কি ইনকাম ট্যাক্স ?

আজ্ঞে না ।

অ্যান্টি করাপশানই তাহলে ?

আজ্ঞে না ।

তাহলে আপনি কোন ডিপার্টমেন্টের ?

তোফাজ্জলের কারখানায় বিড়ি বাঁধার কাজ করি স্যার । বড় ছেলেটা লাস্যেই হয়েছে । তার একটা চাকরির জন্যই ঘোরাঘুরি করছিলাম স্যার আপনার কাছে পিঠে । কিন্তু ওফ, ছেলের চাকরির চেয়েও বড় জিনিস আপনি দিয়েছেন স্যার আমাকে । কী নেশা ; কী নেশা ! একদিন ঘুঘ না খেলেই হাত নিশাপিশ করে, নাক সুড়সুড় করে, মাথা ভোঁ ভোঁ করে । ঘুঘের মতো জিনিস হয় না ।

অ্যা । বলে গোবিন্দ হাঁ করে চেয়ে রইল । তারপর রাগ করে বলল, আরে মশাই, আপনি তো মহা ইয়ে দেখছি, এঃ, আমি আপনাকে ইয়ে মনে করে এতগুলো টাকা গচ্চা দিলাম ।

লোকটা সবেগে মাথা নেড়ে বলল, গচ্চা নয় স্যার, লোকশিক্ষা । ঘুঘ কাকে বলে কখনও জানতুম না স্যার, আপনার দয়ায় জানলাম । এও জানলাম, ঘুঘ ছাড়া মানুষের জীবনটাই আলদানি বিস্বাদ । কি করে যে এত কাল ঘুঘ না খেয়ে বেঁচে ছিলুম তাই ভাবি আর অবাক হই । ঘুঘটা বন্ধ করবেন না স্যার, মরে যাবো ।

গোবিন্দ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, তা বলে—রাগ করবেন না স্যার । আপনার ভুল হয়নি । ঘুঘ জিনিসটায় আমাদের সকলেরই জন্মগত অধিকার ।

কিন্তু পায় করজন ? আপনার দয়ায় এই আমি পেয়েছি ।

তা বলে তোমাকে ঘুঘ দিতে যাবো কেন হ্যা !

লোকটা চোখ নাড়িয়ে নববধূর মতো লাজুক গলায় বলল, সব খবরই নিয়েছি

স্যার। হীরের আংটি, চার হাজার টাকা দামের ঘড়ি, পাঁচশো টাকার মাস্টার—
গোবিন্দ লোকটার কাঁধে হাত রেখে হাসলো। বলল, ঠাট্টা করছিলুম,
কিছু মনে করবেন না। মাঝে মাঝে আসবেন। পরস্পরকে আমরা না দেখলে
কে আর দেখবে!

আজই খাতায় টুকে ফেলব স্যার।

২ ক্ষুধা ও জাতীয় সংহতি

ক্ষুধা কথাটার মানে ব্যাকরণ নহিঁতে আছে “খাইবার ইচ্ছা”। চারদুবাক
মানোটা জানে। আর এও জানে এত বড় ভুল মানে আর হয় না! অন্তত তার
ক্ষেত্রে তো বটেই। চারদুবাকের খিদে পায়, গনগনে খিদে পায়, কিন্তু কখনও
ওই “খাইবার ইচ্ছা” হয় না। পৃথিবীতে এত রকমের খাবার, তার কোনওটাই
তার কখনও মুখে তুলতে ইচ্ছে করে না। খাওয়ার কথা ভাবলেই সে ভয়ে
শিউরে ওঠে। খাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলেই তার মন খারাপ হয়ে যেতে থাকে।
খাবার মুখে তোলা। চিবোনো এবং তা গিলে ফেলা পৃথিবীতে তার কাছে
সবচেয়ে অনির্ভাপ্ত এবং শ্রমসাধ্য কাজ। পেটে খিদে নিয়েই দিবা দিন
কাটিয়ে দিতে পারে সে। দিনের পর দিন।

শিশুকালে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে তার মাকে হিমশিম খেতে হয়েছে।
বুকের দুধ বা ফিডিং বটলের চুষি মুখে নিত না বলে তাকে থাম্পড় মেরে বা
টিমিটি কেটে কাঁদিয়ে নিয়ে কিন্নক দিয়ে গেলানো হত। প্রায়ই সেই দুধ
উগরে দিত সে।

বড় হয়ে চারদুবাক যে বেঁচে আছে এটাই অনেকের কাছে বিস্ময়। তার
বউ শীলার কাছেও। শীলা চারদুবাকের এই অরুচি দেখে দেখে পাগল
হওয়ার উপক্রম। তাকে খাওয়াবেই এই জেদবশে সে হাজার রকমের রান্না
শিখেছে, রেঁধেছে, কিন্তু চারদুবাক এমনভাবে নাক কঁচকে অনিচ্ছা প্রকাশ
করেছে যে অনেকবার আত্মঘাতী হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে শীলার।

কেন খাবে না, কেন খাও না তুমি। কিভাবে বেঁচে থাকবে তবে?

শীলার এই আতর্ প্রশ্নের সামনে খুবই সংকুচিত হয়ে চারদুবাক বলে, বেঁচে
তো আছি। রোগা হলেও দিবা চলে ফিরে বেড়াচ্ছি তো।

কিন্তু আমি যে এত যত্ন করে রাঁধি, এত আদর করে বেড়ে দিই?

তা বটে, কিন্তু পৃথিবীর কোন খাবারই আমার রোচে না।

শীলা রাগে, ক্ষোভে, হতাশায় অসহায়ের মতো কাঁদতে থাকে। চারদুবাক
নির্বাক হয়ে বিষণ্ণ বদনে বসে থাকে।

চারদুবাক ফ্রিজ পছন্দ করে না। বাড়ির মধ্যে দুটি ঘরে সে পারতপক্ষে

টোকে না রান্নাঘর আর খাওয়ার ঘর। সে সবজি বা মাছের বাজারে যেতে খুবই অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সে মিষ্টির দোকান, রেস্টুরেন্ট দেখলে চোখ ফিঁরিয়ে নেয়।

একদিন দুর্দিন পর নিতান্তই বেঁচে থাকার জন্য কিছ্‌র না কিছ্‌র খেতেই হয় চারদুবাককে। সেই সময়টা তাঁর মূখে ফুটে ওঠে ভয়, ক্লোথ, অসহায়তা। ডাক্তাররা তবে এই অরুচির কারণ খুঁজতে গিয়ে হার মেনেছেন। স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাওয়া বা হাওয়া বদল গেছে বৃথা! চারদুবাকের খিদে পায় শব্দ “খাইবার ইচ্ছা” কখনোই হয় না।

একটা সেমিনারে দিল্লি যাচ্ছিল চারদুবাক। ট্রেনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। গিনি, ছেলে, মেয়ে, শালাশালীর বাহিনী নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। বেশ ধমক চমক করে কথা বলেন, আত্মবিশ্বাস প্রবল। লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক চারদুবাককে পেটে আগুলের খোঁচা মেরে তিনি অল্পানন্দনে বললেন, আমি এদের নিয়ে বেরিয়েছি জাতীয় সংহতি জিনিসটা বোঝানোর জন্য। ঘূরবে, ফিরবে, মিশবে, দেখবে, শিখবে, তবে না সংহতির বোধটা আসবে।

চারদুবাক বলল, তা বটে।

চারদুবাকের পেটে দ্বিতীয় খোঁচাটা মেরে ভদ্রলোক বললেন, জাতীয় সংহতি জিনিসটা আর অত সহজ নয় মশাই। এই যে খালিস্তান নিয়ে লড়াই, গোথাল্যান্ড নিয়ে ধানাইপানাই কেন জানেন?

আজ্ঞে না।

খুব সোজা মশাই, খুব সোজা, ভারতীয় হিসাবে তারা নিজেদের আই-ডেনটিফাই করতে পারছে না যে। এত বড় একটা দেশ, এতগুলো ভাষা, এত ধর্ম, আইডেনটিফাই করা কি সোজা? মানুষ দিশেহারা হয়ে যায় না? এই যে আমরা এক পরিবারের এতগুলো লোক একসঙ্গে চলছি এই আমরাই মাঝে মাঝে আইডেনটিটি হারিয়ে ফেলি। তাই আমি—

এই সময়ে ভদ্রলোকের স্ত্রী একটা কাঁসার রেকাবিতে এক গোছা লুচি আর আলুর ছেঁচকি ভদ্রলোককে এগিয়ে দেওয়াতে কথায় বাধা পড়ল। খাবার দেখে চারদুবাকও তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ঘূমের ভান করতে লাগল।

তবে লোকটা খাওয়া সেরে আরও কিছুক্ষণ জাতীয় সংহতির কথা বলে আপার বাথকে শূয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালবেলায় বাংক থেকে নেমে লুঙ্গির কবি আঁটতে আঁটতে চারদুবাকের দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ যে কথাটা হচ্ছিল। ভারতীয় হিসেবে আমাদের আইডেনটিটি কী মশাই? আঁ! আইডেনটিটিটা কী? আমি যে ইন্ডিয়ান, ইন্ডিয়ানরা যে এক পরিবারের লোক তা আমি ফিল করব কীভাবে?

চারদুবাকের ট্রেনে ভাল ঘুম হয় না। মেজাজ শরীর দুই-ই বিগড়ে আছে কোনওরকমে দেঁতো হাসি ছেঁসে বলল, প্রবলেম, দারুণ প্রবলেম।

নো প্রবলেম। জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে হলে কী করা উচিত জানেন ?
করা উচিত—

বলতে বলতে ভদ্রলোক স্ত্রীর দিকে হাত বাড়ালেন। তাঁর স্ত্রী তাড়াতাড়ি একটা লাল রঙের টুথব্রাশ বের করে পেস্ট লাগিয়ে স্বামীর হাতে ধরিয়ে দিলেন, ভদ্রলোক সবেগে দাঁতে ব্রাশ চালাতে চালাতে বললেন, একটা ফ্যামিলি গড়ে তোলা উচিত। আর ফ্যামিলি গড়ে তুলতে হলে—

বার্কি কথাটা পেস্টের পিচ্ছিল ফেনায় চাপা পড়ে গেল। ভদ্রলোক বেসিন থেকে মৃদু ধুয়ে এসে ব্রাশটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে তোয়ালেয় মৃদু মৃদু হাতে মৃদু হাতে বললেন, হ্যাঁ ফ্যামিলি গড়ে তুলতে হলে—

কথাটা ভাল শুনতে পেল না চারুবাক। কারণ সে সবিষ্ময়ে দেখল ভদ্রলোকের স্ত্রী লাল টুথ ব্রাশটা হাতে নিয়ে তাতে ফের পেস্ট লাগিয়ে দাঁত ব্রাশ করতে করতে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন।

চারুবাক একটা শব্দ করল, ওয়াক—

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, ওয়াক দি-ব কিছ্ছু হবে না মশাই। জাতীয় সংহতি গড়ে না উঠলে ওয়াক এগোবে কি করে? দেশপ্রেম বলে কিছ্ছু আছে এখন ভারতবর্ষে? কেউ কারও জন্য ফিল করছে?

চারুবাক ফের একটা ওয়াক তুলতে গিয়েও চেপে রইল জোর করে। তার কপালে ঘাম জমে উঠছিল।

ভদ্রমহিলা ফিরে এসে সেই ব্রাশটায় ফের আর এক দফা টুথপেস্ট লাগিয়ে বড় মেয়েকে বললেন তাড়াতাড়ি যা, বেসিনের জল ফুরিয়ে যাবে।

মেয়েটা অস্মানবদনে ব্রাশটা মুখে পুরে উঠে গেল। চারুবাক শব্দ করল—
ওয়াক ওয়াক—

ভদ্রলোক তার পেটে আঙুলের একটা খোঁচা দিয়ে বললেন, আপনার দুঃখটা আমি বুঝি মশাই, দেশে কাজকর্ম কিছ্ছুই হচ্ছে না। কিন্তু কথা হল কাজটা কার জন্য? দেশ? কোনটা আমার দেশ? বর্ধমান না পশ্চিমবঙ্গ না পূর্বাঞ্চল না ভারতবর্ষ? সাধারণ মানুষরা যে ভারতবর্ষ কাকে বলে তাই জানে না। এমন কি অনেকেই জানে না যে দেশে এখন ব্রিটিশ রুল নেই, অনেকেই জানে না যে...

বড় মেয়ে ফিরে এসে ব্রাশটা তার মায়ের হাতে ফেরত দিল।

চারুবাক সম্মোহিতের মতো চেয়ে দেখল, ভদ্রমহিলা ফের সেই ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে ছেলের হাতে দিলেন। ছেলে ব্রাশ মুখে দিয়ে উঠে গেল।

চারুবাক একটা দুর্বোধ্য গর-র-র-র শব্দ করল।

সরকার? ভদ্রলোক তার পেটে আর একটা খোঁচা দিয়ে ধমকে উঠলেন। তারপর হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, সরকার হল এক বোবা কালা অন্ধ প্রতি-
স্থান। কে কোথায় ধাঁকছে, কে কোথায় খাবি খাচ্ছে, কে দূধে ভাতে আছে,

কে মরল কে পড়ল কোন খবরই সে রাখে না, বৃদ্ধলেন মশাই? এই যে আমি আপনি এই যে আমরা—এই আমরা সবাই বেঁচে আছি যে-যার নিজের দায়িত্বে। সরকার পারবে না মশাই, সরকারের বাপও পারবে না জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে। আসলে—

ছেলেটা ফিরে এল। লাল টকটকে সেই ব্রাশে আবার পেস্ট লাগানো হল। এবার গেল ছোট মেয়ে।

চারদ্বাক খকখক করে কাশতে লাগল। পেটের মধ্যে কী যেন পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে, গোঁতলান দিচ্ছে।

চারদ্বাকের পেটে আর একটা খোঁচা মেরে ভদ্রলোক বললেন, আমরা প্রত্যেকেই যে যার নিজের দায়িত্বে বেঁচে আছি। জ্ঞান আমাদের দেখবার কেউ নেই। আর সেই জনাই আমরা যে যার নিজের ঘর গোছাতে লেগে যাই। আপনি বাঁচলে চাচার নাম। তবে কিনা—

চারদ্বাক মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখল, সেই লাল ব্রাশে ফের পেস্ট লাগানো হয়েছে এবং ভদ্রলোকের বড় শালা ব্রাশটা নিয়ে বাথরুমের দিকে গেল।

চারদ্বাক ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বাক্যহারা, বোধহীন হয়ে যেতে লাগল, তার মাথা ভেঁ ভেঁ করতে লাগল।

ভদ্রলোক তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলে উঠলেন, আর সেই জনাই এখন ভারতবর্ষে গড়ে উঠছে ক্র্যান, লোকাল পার্টি, ধর্মগোষ্ঠী। যেন ছোট ছোট সব ফ্যামিলি, হ্যাঁ, ফ্যামিলি, আর সেই সব ফ্যামিলিতে গড়ে উঠছে—

বড় শালা ফিরে এল। সেই লাল টকটকে ব্রাশটা নিয়ে এবার গেল ছোটো শালা।

চারদ্বাক অজ্ঞান হয়ে যাবে কিনা বৃদ্ধিতে পারছিল না। সে অবশ হাতে নিজের নাড়ী দেখতে লাগল। নাড়ী চলছে, তবে অতি ক্ষীণ।

ফ্যামিলি! বৃদ্ধলেন? ফ্যামিলি! এই ফ্যামিলি ফিলিংটাকে যদি আরও বড় করে দেন যদি ফ্যামিলির মধ্যে গোটা ভারতবর্ষকে টেনে আনতে পারেন যদি—

ছোটো শালা ফিরে এল। চারদ্বাক আর পারল না। অস্ফুট গলায় সে বলার চেষ্টা করল, ব্রাশ...ব্রাশ...

ভদ্রলোক থমকে গেলেন, ব্রাশ? আরে আরে নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, টুথ ব্রাশ আনেননি তো? তাতে কী হয়েছে? আমাদেরটাই নিন না। নিজেকে আমাদের ফ্যামিলির একজন বলে ভাবুন। আরে এইভাবেই তো ফ্যামিলি ফিলিং বাড়়ে, এই ভাবেই তো, ...ওগো ও খেঁদীর মা, দাও দাও ব্রাশে একটু পেস্ট লাগিয়ে দাও—

ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে চারদ্বাকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন এখনও বেসিনে জল আছে। তাড়াতাড়ি চলে যান, এর পর আর...

সম্মোহিতের মতো উঠে দাঁড়াল চারদুবাক । নিজের নয়, যেন অন্য কারও ইচ্ছাশক্তিতে চালিত হচ্ছে সে । কী হচ্ছে তা সে বুঝতে পারছে না । তার গা ঘিন ঘিন করছে, পেটের মধ্যে উথালপাতাল, গলায় আটকে রয়েছে বমি ।

টলতে টলতে চারদুবাক বেসিনের কাছে এল । আয়নায় ওটা তো তারই মূখ ! হ্যাঁ, তারই । তবু মূখটা যেন প্রাত্যহিক নয় । অন্যরকম ।

লাল ব্রাশটা সমেত হাত উঠে এল মূখের কাছে । চারদুবাক সভয়ে চোখ বন্ধ করল ।

তারপর অবধারিত টের পেল, দাঁতের সঙ্গে ব্রাশের সংঘর্ষের সেই চির পরিচিত শব্দ । কুড়কুড় কুড়কুড় ঘূসঘূস, ঘ্যাসঘ্যাস...

মূখ ধুয়ে ফিরে এল চারদুবাক । আশ্চর্য, তার ঘেরািপিস্তি গেল কোথায় ? কেননা যেন ফুরফুরে লাগছে নিজেকে ! জ্বর সেরে গেলে যেমনটা হয় তেমনই যেন ! লাল ব্রাশটা সহর্ষে ওপরের দিকে তুলে ধরলেন ভদ্রলোক । তারপর চেঁচিয়ে বললেন, আর কারও লাগবে দাদা ! দয়া করে বলবেন । বী ওয়ান অফ আওয়ার ফ্যামিলি, বী এ গুড সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া, লজ্জা করবেন না...

একটার পর একটা কুণ্ঠিত হাত এগিয়ে আসতে লাগল একে একে ।

একটা স্টেশন এসে গেছে । প্ল্যাটফর্মে পূরী তরকারী, সিঙ্গাড়া কচোড়ী বিক্রি হচ্ছে ।

চারদুবাক হাঘরের মতো খাবার কিনে গোগ্রাসে খেতে লাগল । তার অরুচি সেরে গেছে ।

৩. বাজী ও কুকুর

বাজির শব্দে কুকুরটা ভয় পেয়ে খাটের তলায় ঢুকেছে । আর সেখান থেকেই পরিব্রাহি আতর্নাদ করে যাচ্ছে । একটানা একঘেয়ে, স্নায়ুবিদারক । ডিউক খুবই ভাল জাতের অ্যালসেশিয়ান কুকুর । কখনও কাঁদে না বা ডাক ছেড়ে চেঁচায় না । ধমক শোনে, আদর সোহাগ বোঝে । কিন্তু কালীপূজোর দিন তার সব শিক্ষাদীক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে সে রাস্তার কুকুরের মতোই চেঁচায় ।

রণেন অনেকবার চেষ্টা করেছেন ডিউককে ঠাণ্ডা করতে অন্তত চুপ করিয়ে রাখতে । পারেননি । এখন কুকুরের চিৎকারে তাঁর স্নায়ু বিকল হওয়ার জোগাড় ।

ডিউকের সঙ্গে রণেনের তেমন মাথামাখি নেই । গৃহপালিত পশুপাখি তাঁর পছন্দ নয় । ছেলেবেলায় আদরের কুকুর, বেড়াল ও পাখির মৃত্যু কয়েকবার দেখেছেন, পোষা খরগোশ তাঁর কোলেই মরে গিয়েছিল । সেই থেকে তিনি আর পশুপাখি পোষেননি ।

ডিউককে কোন এক কুকুর-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনে এনেছিল তাঁর ছেলে লুকু। এনেছিল তাঁর জনাই। বছর দেড়েক আগে রণেনের স্ত্রী রজাবতী আকস্মিকভাবে মারা যান। রণেন যে খুব ভেঙে পড়েছিলেন তা নয়। তবে একটু চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। লুকু ধরে নিয়েছিল, তিনি পত্নীশোকে ভেঙে পড়েছেন। নানাভাবে রজাবতীর শ্মশান স্থান পূরণের একটা অক্ষম চেষ্টা লুকু করেছে। কাজটা সে ছেলে বলেই করেছে। কিন্তু ফলটা ভাল হয়নি। রজাবতী মারা যাওয়ার পর তাঁকে পুরী এবং ভুবনেশ্বর ঘুরিয়ে এনেছিল লুকু এবং তার জন্য নিজের বউ সুমিতার কাছে যথেষ্ট কটু কথা শুনছে। আদিখ্যাতা আজকালকার মেয়েরা পছন্দ করে না। তার ওপর এই কুকুর। লুকুর ধারণা, কুকুরটা সঙ্গী হিসেবে থাকলে রণেনের মনটা একটু ভাল থাকবে, বিদেহী পত্নীপ্রেম হয়তো বা কুকুরকে কেন্দ্র করে একটা আশ্রয় পেয়ে যাবে। প্যারিস, বলাই বাহুল্য, কারণ রণেনের পত্নী-প্রেম ছিল না। সরমেশ-প্রেমও তাঁর দরকার নেই। তবু লুকু পাছে দৃষ্টি পায় সেই ভেবে তিনি প্রথম প্রথম জোর করে কুকুরটাকে একটু একটু লাই দিতেন। তারপর সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে পড়েন। আসলে বড়ো বয়সে একটাই অভাব থাকে। কথা বলার লোক থাকে না। আর বৃকে এক গাঢ় কথা জমে থাকে কাউকে বলবার জন্য। যেমন ছিল তাঁর নানীত জয়। কিছু বদ্ব্যভূত না, কিন্তু শূন্যত। বলতও অজস্র। ঠিক যেমন বন্ধুরা হয় আর কি।

একদিন লুকুকে তিনি বলে ফেলেছিলেন, জয়টা যদি কাছে থাকত তবে বেশ হত।

লুকু অবাক হয়ে বলল, সেটা কী করে সম্ভব ?

রণেন জানেন, সম্ভব নয়। তাঁর একমাত্র নানীত জয়কে বছরখানেক হল নরেন্দ্রপদ্রর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। ওরকম নামী স্কুলে যে ভর্তি করা গেছে সেইটাই লোকে সোভাগ্য বলে মানবে। সূত্রাং তাকে আর কাছে পাওয়ার আশা করা বৃথা। তবে স্কুল বন্ধ থাকলে আসে। এখন যেমন এসেছে। কিন্তু সেই আগের জয় আর নেই। এক বছরের মধ্যেই কেমন একটু সাবালক এবং ভারি ক্লি হয়েছিল। দাদু-দাদু এখনও করে বটে, কিন্তু কেমন যেন একটু কেজো মানদ্রুষ হয়ে গেছে, সেই নেই-আঁকড়ে আবদারে ভাবটা আর নেই।

ঘাড়ো দীর্ঘদিনের স্পেন্ডেলাইটিসের ব্যাথা ! তবু নিচু হয়ে চৌকির তলায় কুকুরটাকে দেখবার চেষ্টা করছিলেন রণেন। গলা তুলে কেঁ-উ কেঁ-উ করে ডাকছে। সম্ভো থেকে ডাকছে বলে গলাটা কি একটু ভাঙা ভাঙা ?

বাড়িতে রণেন আর রামাবান্নার লোকটি ছাড়া কেউ নেই। শর্মিতাদের বাড়ি বাগনাজারে বিরাট করে কালীপুজো হয়। অনেক টাকার বাজি পোড়ে, গোটাকয়েক পাঁঠা বলি হয়। ওরা আজ ওখানেই থাকবে। তবে লুকু ফিরে আসতে পারে। সেরকমই বলে গেছে।

শিবু। শিবু। আবার ডাকলেন রণেন। এ পর্যন্ত বছরবার ডেকেছেন।

শিবু ফ্ল্যাটে বা আশেপাশে নেই। রান্নাঘর খোলা পড়ে আছে, বার্তা জ্বলছে। পনেরো ঘোলো বছরের ছেলেকে আজকের রাতের অনামনস্কতার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। দশতলার ছাদে বাজি পোড়ানো হচ্ছে, একতলায় পুজো। তারই কোথাও গিয়ে সেরেটে আছে। ডাল ভাত তরকারি ঝোল সব ওবেলাই রেখে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। রাতে শুদ্ধ গরম করে দেবে। রণেন রাত দশটা সাড়ে দশটার আগে খান না। সুতরাং শিবু নিশ্চিন্ত।

রণেনের ফ্ল্যাটটা বেশ বড়ই। দেড়হাজার স্কোয়ার ফুট। সম্ভাগ্যভার সময়েও সোরা লাখ দাম পড়িছিল। এখন হেসে খেলে ছ-সাত লাখ টাকা। রক্তাবতীর নামেই করেছিলেন। এখনও তাঁর নামেই আছে। এই ফ্ল্যাটে রণেনের নিজস্ব একখানা ঘর আছে। সবচেয়ে ছোটো ঘরখানাই তিনি বেছে নিয়েছেন। সেই ঘরে জিনিসপত্র বলতে গেলে কিছুই নেই। খরচ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনকেও সংকুচিত করে ফেলেছেন তিনি। জামাকাপড়ের ওয়ার্ডরোব একসময়ে উপচে পড়ত। আজকাল একজোড়া হাওয়াই আর একজোড়া বেরোনোর চম্পল। বারোটা লাইটার ছিল। সিগারেট ছেড়েছেন তিন বছর আগে। এখন একটাও লাইটার নেই। বক্স খাটটা ছেলেকে দিয়ে একখানা সাধারণ চৌকি পেতে নিয়েছেন ঘরে। আর একখানা ইঁজিচেয়ার। ছোট্ট একটা টেবিল। রণেনের বিষয় সম্পত্তি বলতে এইটুকুই। তবে বইপত্র কিছু আছে, কিছু সাময়িক পত্রিকা। এগুলোই অবসরের সঙ্গী।

কাচের শার্শি সবই বন্ধ। তবু বিভৎস লাগাতার বাজির শব্দ ঠেকানো যাচ্ছে না। এরকম ছেদহীনভাবে বাজি পোড়াতে হলে কত টাকা খরচ হতে পারে তা রণেন ভেবে পান না। তার ওপর এই শব্দ সহ্য করার জন্য শক্ত নাভও চাই। বাজির শব্দের সঙ্গে ডিউকের চিৎকার রণেনকে বেন খান খান করে ভেঙে ফেলেছে।

অন্য সব ঘরের দরজা বন্ধ এবং চাবি দেওয়া। কেন কে জানে, ওরা কোথাও বেরোলে ঘরগুলো সব বন্ধ করে রেখে যায়। শুদ্ধ বসার ঘর আর রান্না ঘর খোলা থাকে। রণেনের অন্য কোনও ঘরে গিয়ে আত্মরক্ষা করার উপায় নেই, বসার ঘর ছাড়া। কিন্তু বসার ঘরটা গিয়ে শেষ হয়েছে গ্রীল দেওয়া বারান্দায়। সেখানে কোনও কাচের শার্শি নেই। এই সাম্প্রতিক, প্রাণঘাতী বাজির শব্দ সেখানে আটকানো যাবে না। আর তিনি গেলে ডিউকও তাঁকে অনুসরণ করবেই।

অসহায়ভাবে রণেন ইঁজিচেয়ারে বসে একটা মাগাজিন খুলে অনামনস্ক হওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভিতরটা এমন কাঁপছে, এত অস্থির লাগছে যে উঠে পড়তে হল।

ঘাড়ের ব্যথা নিয়েই আবার নিচু হলেন, ডিউক! ডিউক!

ডিউক ফিরে তাকাল এবং বলল, কী বলছ?

রণেন ছিটকে পড়লেন মেঝের। মাথাটা ঝিমঝিম করল। আজকাল বড়ো বয়সে কি ভীমরতি ধরল! না কি স্বপ্ন দেখছেন?

বঁা কনুইতে একটু চোট পেলেন। তবে তেমন কিছুর নয়। ফের উঠলেন রণেন। সভয়ে নিচু হয়ে ডিউকের দিকে চাইলেন। ডিউক দৃথাবার মধ্যে মাথা কেঁউ কেঁউ করে কাঁদছে।

ডিউক!

তখন থেকে কেন যে ডাকছো! আমি বেরোবো না। যাও।

বৃকটা ধক করে উঠেই যেন কয়েক সেকেন্ডের জন্য থেমে গেল। তবে ফের চলল। ধড়াস ধড়াস করে। একটু শ্বাসকণ্টও হাতে লাগল রণেনের।

সাবধানে আবার ডাকলেন, ডিউক!

তখন থেকে কেন যে ফ্যাচ ফ্যাচ করছ! কী লাও বলো তো!

অবিশ্বাস্য। সম্পূর্ণ ভৌতিক! অলৌকিক! তবু রণেন এবার নিজেকে শক্ত রাখলেন। কাঁপা গলাষ বললেন, তুই কি কথা বলতে পারিস?

পারি। তবে এখন কাঁদছি। কাঁদতে দাও।

কাঁদাছিস কেন?

আমার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ছে।

পূর্বজন্ম? ওরকম কিছুর সত্যিই আছে নাকি?

আছে। না থাকলে মনে পড়বে কেন?

পূর্বজন্মে তুই কী ছিলি? কুকুরই তো!

না। তবে কুকুরের অধম। বারোটা ছেলেপুঁলে ছিল। না খেয়ে খেয়ে, রোগে ভুগে চোখের সামনে মরেছে। দুটোকে চোর বলে পিটিয়ে মারে। একজন জেল খাটিছিল। সে বেঁচে আছে কিনা জানি না। রাস্তার কুকুরের মতো এঁটো-কাঁটা খুঁটে খেতুম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতুম, কুকুরের মতোই যদি বেঁচে আছি তবে কুকুরই করলে না কেন? সেই প্রার্থনা ভগবান বোধহয় শুনিয়েছেন। বার্জর শব্দে মাথাটা কেমন টলমল করছিল, হঠাৎ সব মনে পড়ল।

এজন্মে তোর কেমন লাগছে?

সুখে আছি, বেশ সুখে। আগের জন্মের চেয়ে ঢের ভাল মাংসের সুরুরা খাই, গমের খিচুড়ি, সাত তলায় বাস, সুখের বাকি কী? শুনলুম তোমার ছেলে-আমাকে সাতশ টাকায় কিনেছে! শুনলে ভারী আনন্দ হল। আমার এত দাম হবে ভাবিনি কখনো।

চুপ, চুপ। অত টাকায় তোকে কেনা হয়েছে তা খবদার বলিসনি। তাহলে লোককে তার বউ বকবে।

জানি। লোক কামিয়ে বলেছে। সত্তর টাকা। তাইতেও বাপান্ত হুচ্ছে। কিন্তুঃয়ার জন্য কেনা হল সে পান্তা দিচ্ছে না।

রাগ করিস না ডিউক। আমি কি জানতুম যে—

তোমার বউয়ের অভাব আমি মাদী কুকুর হয়েও পূরণ করতে পারব না
বাপু, তা ঠিক ।

তুই মাদী নাকি ?

তাও জানো না ! আচ্ছা লোক বাপু !

তোমার নাম যে ডিউক ।

সে যদি তোমরা নাম দাও তাতে আমার কী করার আছে ?

আগের জন্মে মদ্য ছিল ?

না, মাদীই । বললুম না রাস্তার কুকুরের মতো জীবন ছিল । বারোটা বাচ্চা
হল বারোটা পদ্রুকের দোষে । তারা কেউ আমার স্বামী ছিল না । আমি
তো বেওয়ারিশ, বেশ্যার অধম ।

খুব কষ্ট ছিল তোমার !

এখনও আছে । বড় কষ্ট । এখন যাও ইজিচেয়ারে বসে থাকো গে । আমি
একটু কাঁদি ।

কাঁদ ডিউক ।

রণেন ইজিচেয়ারে এসে বসলেন । একাই একটু হাসলেন তিনি । খুশিই
লাগছে মনটা । কথা বলার মতো একজনকে পাওয়া গেল এত দিনে । সময়টা
কেটে যাবে ।

সংসার

“বিয়ে তো জীবনে একবারই হয়!” এই বলে বড় অভিমান করে থাকে নতুন বো।

বেশীর ভাগ বাঙালী ছেলেই বিয়ের পর প্রথম নারীসঙ্গ পায়। বো-এর বরটিও তাদের একজন। জীবনে এই প্রথম নারীর নিবিড় সান্নিধ্য এমনতেই তার মাথার সবটুকু ঘোলাটে করে রেখেছে। এই নিজস্ব মেয়েমানুষটির কাছে কতভাবে নিজেকে বড় করে দেখানো যায় তার নানা ফন্দি-ফিকির মাথায় খেলছে সব সময়। কি বললে খুশী হবে মেয়েটি। কি করলে মৃদু হবে একেবারে? একবার ইম্প্রেস করার জন্য বলে ফেলেছিল—জানো, সামনের বছর আমি একটা স্কুটার কিনবো! নতুন বো শিউরে উঠে বলেছিল—খবরদার না। ভীষণ অ্যাকসিডেন্ট হয় ওতে।

ছেলেটি ভীষণ খুশী হয় তাতে! আসলে স্কুটার তার কপিটং-এ আসে না, নিকট ভবিষ্যতে আসবেও না। কিন্তু বিয়ের সাতদিনের মাথাতেই মেয়েটি বলে দেয়—সবাই হানিমুনে যায়। আমরা যাব না?

শুনে ছেলেটা মনে মনে গদম হয়ে যায়। বিয়েতে সবসময়ে বাজেট ছাড়িয়ে খরচ হয়। তারও হয়েছে। তাছাড়া ছুটি পাওনা নেই তেমন। ছেলেটা আবার একটু ঘরকুনোও। জবাব দিল—এসব ইংরিজিয়ানার কুফল। বিদেশী প্রথা। আমরা এসব মানবো না। বো খুশী হয় না। অভিমান করে বলে—বিয়ে তো জীবনে একবারই হয়! সবাই যায়। বিদেশী প্রথা আবার কি? তুমি তো বাপু দিবা প্যান্ট শার্ট পরে অফিসে যাও, সেটা ইংরিজিয়ানা নয় বুঝি?

ছেলেটা সিগারেট ধরায়, খুব সিরিয়াসভাবে বোয়ের মুখ দেখে। তারপর বলে—দেখি।

বো আশান্বিত হয়ে বলে—খুব দূর নয়, নিজের জায়গায় যাবো কিন্তু। শুধু তুমি আর আমি।

—পদুরী?

—আমার পাহাড় ভালো লাগে।

—দার্জিলিং?

—হ্যাঁ-অ্যা। বো হেসে গাল কাত করে দেয়। বিয়ের পর থেকে মা একটু গম্ভীর। ছেলের সঙ্গে খুব ভালো করে কথা কন না। তাকানোর মধ্যে কেমন যেন একটু উদাস উদাস অভিমান ভাব! খেতে বসেছে ছেলেটি, মা ভাত দিয়ে বলল—সীমা বলছিল, দাদা-বোদি হানিমুনে যাচ্ছে। তা কোথায় যাওয়া ঠিক করলি?

—কোথায় আর যাবো ? এখনো কিছু ঠিক নেই । ছেলেটি হঠাৎ লজ্জা পেলো যেন, সেটা ঢাকতে গোপ্লাসে খায় ।

—আস্তুে খা । মা একটু চুপ করে থেকে বলেন—উনিই নতুন বোয়ের মাথা খাচ্ছেন । কেবল শুননি বলেন, যাও ঘরে টুরে এসো । একটু নির্বিবলিতে ঘরে এলে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো হয় ।

উনি হলেন ছেলেটির বাবা । প্রশ্ন কিছটা বেশীই দেন নতুন বোকে । বলেন—সংসারের চার্জ এবার থেকে তোমার বোমা । বুঝেবুঝে নাও ।

মা তাতে খুশী হন না । আড়ালে বলেন—কেন, আমার কি গতরে শৃঙ্খলা-পোকা ধরেছে ! সংসারের টানাপোড়েনগুলো ছেলেটা বিয়ের আগে বুঝতে পারতো না । এখন কিছু কিছু পাবছে ।

নতুন বো একদিন রাতে বল্লো—সীমা আজ কি বলেছে জানো ! বলেছে দাদা বিয়ের আগে একটুও স্টাইল করতো না । আজকাল খুব পোশাকের দিকে নজর । আমার বলেছে, বিয়েতে দাদার অনেক খরচ হয়েছে । হানিমুন্-টুন করতে গেলে সংসার ভেসে যাবে । কি হিংসুক দেখো ।

ছেলেটা উদাস মন-খারাপ গলায় বলে,—ওর মনটা ভালো ।

—ছাই ভালো ! তোমার আমার বেশী ভাব পছন্দ করে না । আমি দেখবো বিয়ের পর ও নিজেকে হানিমুন্নে যায় কি না !

ছেলেটার অনেক রাত পর্বস্তু ঘুম আসে না । পূজোর আর দেরী নেই । দার্জিলিং-এ মরসুম পড়ে গেল ! রিজার্ভেশনের কাউন্টারে মারকাট হচ্ছে । কত লোক যে দার্জিলিং-এ যাবে ।

অনেক ধস্তাধস্তির পর দার্জিলিং-এর দুটো রিজার্ভেশন পায় । বারোদিনের ছুটি নেয় । বাবার হাতে সেই মাসে বরাদ্দের পঞ্চাশ টাকা কম দেয় । মার মুখ গম্ভীর । বোনের মুখ ফস্কা, বলেই দেয়—মধুচন্দ্রিমা-চন্দ্রিমা ওসব বড়-লোকেরা করে ।

ছেলেটার মন খারাপ হয় । কিছু বো খুশী, বাড়ীর সবাই হিংসে করুক তাকে । হিংসে করে জ্বলুক ।

পথের কষ্ট যা হওয়ার হলো । অনর্গল পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে । কুলি, খাবার, চা । দার্জিলিং-এ যত সন্তায় থাকবে ভেবেছিল, হল না । কুড়ি টাকা রোজের হোটেল ভাড়া । বহু কষ্টে একটা বাড়ীতে বত্রিশ টাকার পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে হলো । কুড়ি টাকা পার হেড রোজের বাজেট ছিল । তার উপর বারো টাকা বাড়তি : সুতরাং বোকে চুপি চুপি বলল—চার দিনের বেশী থাকা যাবে না, টাকা নেই । বড় মেঘলা দার্জিলিং । বৃষ্টি পড়ছে প্রায়ই । চাঁদ-টাদ দেখা যায় না, পাহাড় মুখ লুকিয়ে আছে । ছেলেটা কয়ল চাপা দিয়ে ঠাং নাচাতে নাচাতে বলে—টাকাটাই লস্ ।

বো ঝামটা মেরে বলে—লস্ আবার কি ? আসা তো হলো । লোকে বলতে

পারবে না যে ওরা হানিমুনে যারনি ।

পূজোর দিন কটা কলকাতায় কাটাতে হল না, ছেলেটার এইটুকুই লাভ ।

বৌ পাখরের মালা কিনতে চায়, বরের জন্য সস্তায় ভুটিয়া সোয়েটার, ননদের জন্য আর কিছ্‌দু । ছেলেটা সবরকম কেনাকাটায় বাধা দিতে থাকে কেবল বলে—উঁহু, বাজেটে আসবে না ।

দুর্দিন পর রোদ উঠলো । খুব বেড়ালো দুজনে সেদিন । পরদিন জীপ ভাড়া করে টাইগার হিল, ঘুম, মন্‌স্ট্রি, সিগ্‌ল লেক দেখলো । এক স্বর্গীয় আনন্দের জলে যেন মুখ খুয়েছে বৌ, এমন উজ্জ্বল দেখালো তার মুখ, ছেলেটা নিসর্গ থেকে কোন আনন্দ পায় না, কেবল টাকার চিন্তা । তবু বৌ-এর মুখ দেখে তারও কেমন একটু খুশীর ভাব এলো । আহা, ওতো খুশী হয়েছে !

ফেরার সময় শিয়ালদা স্টেশনেই টাকা শেষ । ট্যাক্সি করে বাড়ী এসে ভাড়া মেটালো ।

বাড়ীঘর কেমন জীর্ণ লাগছে ছেলোটর । মা বাবাকে কি আর একটু বড়ো দেখাচ্ছে ? সীমারও কন্ঠার হাড় বেরিয়েছে বড়িঝ । কিন্তু একটা বড় পরিবর্তন দেখলো ছেলোট । সে ফিরে আসায় সবাই খুশীতে ছুটে এসে ধরলো তাদের ।

—অ বোমা, কেমন দেখলে, ভালো ছিলে তো সব ? কি রকম বাজার দর ওখানে ? বাঃ বৌদি, এ মালাটা আমার জন্যে এনেছো ? ভীষণ সুন্দর তো ! বৌ নিজের নাম করে অনেকগুলো জিনিস কিনেছিলো, কিন্তু ছেলোট অবাধ হয়ে দেখলো, সে সব জিনিস অকৃপণভাবে বাড়ীর সবাইকে বিলিয়ে দিচ্ছে বৌ । সে রাতে যখন চাঁদ উঠলো তখন ছেলোট ছাদে শূয়ে শূয়ে ভাবলো, বাঃ, বড়ো মিষ্টি চাঁদ উঠেছে,তো আল !

নসিরাম

রামতাবণ লোকটা অভদ্র বটে, কিন্তু ত্যাঁদড় নয়, বুদ্ধালি সতু ?

সতুর কথা বলার মতো অবস্থা নয় । চকবেড়ের হাটে নকরের তামাকপাতার দোকানের পিছন দিকটার নিরিবির্লিতে রোদের দিকে হাঁ করে চোখ বৃজে আধশোয়া হয়ে বড় বড় শ্বাস টানছে । একবার শূদ্ধ মাথাটা নেড়ে জানাল, কথাটা ন্যায্য ।

মরা কুল গাছটায় থিক থিক করছে শূন্যশোকা । কাঁচা নর্দমায় পাঁক পচে ফেঁপে উঠেছে । দুপুরের রোদে ঘাটা-পড়া নর্দমার বটু একটা গন্ধ ছড়াচ্ছে কখন থেকে । আর কিছু দেখার নেই লক্ষ্মীছাড়া জায়গাটায় । দুদিকে দু'সারি দোকানের পিছন । লোকজনের যাতায়াত নেই, শূদ্ধ দোকানীরা মাঝে মাঝে পেছাপ করতে আসে । মতি সিং-এর শিকলে বাঁধা সাইকেলটার একটা চাকা দেখা যাচ্ছে বেড়ার আড়াল থেকে । য়িষ্ঠির পালের দোকানের পিছন দিকটায় মস্ত একটা মানকচর গাছ । লালদু মিঞার টেলারিং-এর চালে একটা নখর বেড়াল বসে আছে কখন থেকে, নড়ছেও না চড়ছেও না ! গদার চায়ের দোকানের পিছন দিকটায় কানা লক্ষ্মীকান্ত এক নাগাড়ে কয়লা ভেঙে যাচ্ছে । এসব আলাগা চোখে লক্ষ্য করতে করতে বাঁ গালে একবার হাত বোলায় নসিরাম । গালে রক্ষ দাঁড়ি খড়খড় করছে । আর দাঁড়ির নিচে এখনো চিনচিনে বাথা । রামতারণের থাবড়াটা তার চোয়াল যে খসিয়ে দেয়নি এই যথেষ্ট ।

বুদ্ধালি সতু ! নসিরাম গালে হাতখানা চেপে রেখেই বলে, রামতারণ থানা-পদলিশও করতে পারত । একেবারে জলের মতো কেস ।

রামতারণের থাবড়াগুলো খুব অল্পের ওপর দিয়ে যায়নি । সতু এমনিতেও কিছু রোগাভোগা লোক । কাদিন আগেও নাবা হয়ে চোখ মূখ সব হলদুদচোবা হয়ে গিয়েছিল । শেষে বৈরাগী মন্ডল কাঠির মালা করে দেয় । সে ভারী মজার ব্যাপার । একশ আটখানা বড় প্রমাণ কাঠি সূতোয় বেঁধে চুড়ির মাপের ছোট্ট একখানা মালা রক্ততালুতে রেখে বলল, হাত দিয়ে চেপে থাকো ! সতু তাই থেকেছিল । দেখ না দেখ সেই মালা আপনা থেকেই বড় হতে হতে মাথা গলিয়ে গলিয়া চলে এল । ঘন্টা কয়েকের মধ্যে সেই মালা বেটপ বেড়ে নাই-কুণ্ডলি ছুঁই ছুঁই । সকালে বাসিমুখে চূনের জলে সতুর হাত ধুয়ে দিয়েছিল মন্ডল । একেবারে হলদুদগোলা হয়ে গেল ফটফটে সাদা জলটা । দুপুরের দিকে মালা বেড়ে যখন শরীর গলিয়ে যাওয়ার মতো হল তখন মালা ছাড়ল সতু, দাঁত মাজল, খেল । নাবা সেই বিদেয় হল বটে, কিন্তু শরীরটা এখনও যুতের নেই । রাম-

তারণ ভাল খায়দায়। হোঁতকাটার এক একটা হাতের ওজনই গোটা সতুর সমান। তার ওপর থাবড়া মারার সময় রামতারণ আবার বাঁহাতে সতুর চুল-টাও ধরেছিল মদুঠ করে। লেগেছে খুব। সতু এখনো দম ফিরে পায়নি মাথা বিমর্ষিত করছে। তবে নসিরামের কথাটার একটা জবাব দিল সে। বলল, পুর্লিশ আর এর বেশী কীই বা করত ! যা ঝেড়েছে ! ওফ !

এ কথায় নসিরাম একটু লজ্জা পায়। রামতারণ দৃজনকেই ঝেড়েছে বটে কিন্তু তার তেমন লাগেনি। চোয়ালের ব্যাথাটা দিন দুই থাকবে হয়তো। তবে তেমন কিছ্ছু নয়। চোয়ালের হাড় সরে যায়নি, দাঁত ভাঙেনি ! গালের মাংসে দাঁত বসে যাওয়ায় ক'ফোঁটা রক্ত পড়েছিল শুধু। সে কথা বলল না। রোঁয়াহীন একটা শালিকের বাচ্চা কোথা থেকে পড়েছে নর্ম্মার ধারে। কয়েকটা কাক সেটাকে ঠুকরে ঠুকরে শেষ করল এইমাত্র। মা-শালিকটা ধারে কাছে নেই, থাকলে কাককে মজা দেখাত। নসিরাম বদ্বতে পারছে রামতারণের পক্ষ নিয়ে কথা বলা তার উচিত নয়। বললে হয়তো সতু ভাববে, মার খেয়ে নসিরামের মাথাটাই গুলিরে গেছে।

কিন্তু ঘটনাটা ঠিক ঠিক বিচার করলে রামতারণকে কি দোষ দেওয়া যায় ? গাজিপুর্ থেকে তারা রামতারণের পিছন নিয়েছিল। নেওয়ারই কথা। রামতারণ আদায়-উসুল করে ফিরছে। গাজিপুর্রের গোটা বাজারটাই ওর কেনা। মেলা টাকা। একজন পাইকও সঙ্গে ছিল। লহরার ইসমাইল। তার কোমরে চাকু, হাতে লাঠি।

সতু আর নসিরাম সব খবরই নিয়েছিল। বনিবিবিতলায় ইসমাইলকে ছেড়ে দেবে রামতারণ। কারণ ওখানেই ইসমাইলের দু নম্বর বিবি ওলন থাকে, ওলন ভারী আহাদ্দী মেয়েমানুষ। বদ্বকে দয়ামায়া আছে, ধর্ম্মভয় আছে। বড় একটা এদিক সেদিক করে না। তবে ইসমাইল বা রামতারণ কেউই লোক ভাল নয়। শোনা যায় ইসমাইল ওলনকে রামতারণের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়ার তল্লা আছে। ওলনবিবি দেখতে খারাপ নয়। বালবাচ্চা নেই, শরীরটাও তাই ভাঙেনি।

ইসমাইলকে ছেড়ে রামতারণ বনিবিবিতলার বড় মাঠে পড়ল। পথও আর বেশী ছিল না। মাইলটাক গেলেই পীরগঞ্জের পাকা ঝড়ক। ফটফট করছে দুপুর্নের রোদ। ছাতা মাথায় রামতারণ দুলকি চালে হাঁটছিল। আচমকিই সতু আর নসিরাম চড়াও হল তার ওপর। সতুর হাতে ভোজালি, নসিরামের হাতে দেড়-ফুট লম্বা গুপ্তি ছোরা।

রামতারণ ভয় খেয়েছিল কিনা বলা শক্ত। তবে একটু ভাবাচাক্য খেয়েছিল ঠিকই। সতু ভোজালিটা আপসাতে আপসাতে বিকট গলায় বলল, জয়কালী, করালবদনী ! একদম চেঁচামেচি করবে না বলে দিচ্ছি। লাশ ফেলে দেবো। এইখানেই লাশ পড়ে থাকবে, কুকুরে শেরালে ছিঁড়ে খাবে। মালটা দিয়ে দাও ভালোর ভালোর। পাশ থেকে গুপ্তির চোখা ডগাটা রামতারণের ভাঁড়িতে

ঠেকিয়ে রেখেছিল নসিরাম। তেমন বেগতিক দেখলে ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা। তবে সেটা কথাই। সতুও কোনদিন কারো লাশ ফেলেনি, নসিরাম গদীপ্তি ঢুকিয়ে দেয়নি। তেমন জোরালো কলজে তাদের নেই। কিন্তু রামতারণের তো ভয় খাওয়ার কথা, দু দুটো ঝকঝকে অস্ত্র চোখের সামনে দেখেও শালা ঘাবড়ালো না! অ্যা! নসিরাম ঘটনাটা আবার ছবির মতো দেখছিল চোখের সামনে।

সতু চোখ পিটিপটি কবে দেখছিল নসিরামকে। হঠাৎ অন্তর্মীমার মতো বলে উঠল, শালা ভয় খেল না কেন বলো তো!

নসিরাম বিরক্ত হয়ে বলল, কাজের সময় বেশী কথা কইতে নেই। যারা বেশী কথা কর তাদের কেউ ভয় খায় না।

সতু ফিসফিস করে বলল, মালা ছাড়ছিল না যে!

ওর বাপ ছাড়ত। দুটো খোঁচা খেলেই বাপ বাপ বলে ছাড়ত। ভোজালিটা তোমার হাতে ছিল কী জন্যে!

সতু মইয়ে গেল। ফের হাঁ করে শ্বাস টানতে লাগল চোখ বুজে। দোষটা সতুর ঘাড়ে চাপাল বটে নসিরাম কিন্তু পুরো দোষটা ওর নয়। বোধ হয় ওর চেহারাটারই দোষ। লাঙপ্যাঙে একটা লোক যদি ভোজালি নিয়ে কেরদানি দেখায় তবে কার না ইচ্ছে করে তাকে একটা থাবড়া বসাতে? তার ওপর সতু হঠাৎ রামতারণের বুচ্ছে গাইতে শুরুর করল, তেঘরেতে তোমার বাপের একজন রাখা মেয়েমানুষ আছে। সব ফাঁস করে দেবো। ইসমাইল মিঞার দুঃস্বপ্ন বিবি ওলনের সঙ্গে তোমার আশনাইয়ের কথাও জানি। হুপ্তায় দুর্দিন ওলনের ঘরে তুমি যাও। টাঁ ফোঁ করেছো কি এসব কথা ঢোল-সহরত হয়ে যাবে! বুকুেছো?

রামতারণ আচমকাই থাবড়াটা কষাল। আর সে কী থাবড়া বাপ! সতুর মনুডুটা তখনই ধড় ছেড়ে উড়ে গিয়ে আলের ধারে পড়ার কথা। শব্দটাও হল বোমার মতো। সেই শব্দে কেমন অবশ হয়ে গিয়েছিল নসিরাম। হাতের গদীপ্তির কথা তখন বেবাক ভুল। সেই অবশ অবস্থাতে রামতারণ হঠাৎ ঘুরে তাকেও একটা ওরকম থাবড়া কষাল। মাঠের মধ্যে দিনের আলোর অন্ধকার দেখতে দেখতে মাটিতে বসে পড়ল নসিরাম। আর রামতারণ তখন এক হাতে সতুর চুল ধরে তুলে পটাপট কয়েকটা থাবড়া দিয়ে গেল নাগাড়ে। সতু চেঁচা-ছিল, আর মেরো না। ন্যাবা থেকে উঠেছি, শরীর যুতের নয় হে, মরে যাবো।

হোঁতকাটা এ কথায় থামল। তারপর ফ্যান্সিফাসে গলায় জিজ্ঞেস করল, তোরা কারা?

সতু মাটিতে পড় চষা ক্ষেতের এক চাঙুর মাটি আঁকড়ে ধরে দম নেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। কথা বলার অবস্থা নয়। লুঙ্গি খুলে গিয়ে দিগম্বর অবস্থা তার।

নসিরাম টলতে টলতে দাঁড়িয়ে বলল, আজ্ঞে আমরা হচ্ছি—বলে একটু ভাবতে হল। নাম দুটো স্মরণ হচ্ছিল না ঠিক।

রামতারণ ধমক দিল, কারা তোরা ?

আমি নসিরাম ।

আর ও ?

ও তো সতু !

কোন গাঁ ?

আমি লোহারগঞ্জ, আর ও কালীতলা ।

ঠিকঠাক বলছিঁস ?

বানানোর মতো কথা মাথাতেই আসছে না । ঠিকঠাক না বলে উপায় কি ?
নসিরাম জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল শূন্যে ।

রামতারণের বোধ হয় তাড়া ছিল, দু'জনের জন্য যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে ভেবে চোখ পাকিয়ে বলল, এই দণ্ডে এই তল্লাট ছেড়ে চলে যাবি । ফের দেখতে পেলো পদে ফেলব । যাঃ যাঃ যাঃ...

গরু তাড়ানোর মতো তাড়া খেয়ে তারা দু'জনে সেই দণ্ডেই মাইলটাক পথ হেঁটে চকবেড়ের খাল পেরিয়ে হাটে এসে সেঁদিয়েছে । ভরের চোটে এতক্ষণ গা-গতরের ব্যথা তেমন টের পারিনি । এখন পাচ্ছে । তবে গায়ের ব্যথাটা বড় কথা নয় । রামতারণ ইচ্ছে করলে পীরগঞ্জের থানায় তাদের জমা করতে পারত । আরো বিপদের কথা, ইসমাইলকে লাগাতে পারত পিছনে, ইসমাইলের জমার ঘরে অন্তত পঁচিশটা খুন লেখা আছে । আরো দুটো বাড়লে ক্ষতি ছিল না ।

নফর চেনা লোক । কিন্তু তাদের দেখে খুঁশি হ'য়নি মোটেই । ছু'জনের চেহারা দেখেই বিরস মুখে বলল, কোথেকে চোরের ঠেঙানি খেয়ে এসেছো ! ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো । আমি ঝামেলা পছন্দ করি না ।

তা চোরের ঠেঙানিও তারা খেয়েছে বৈকি । নফরের দোষ নেই । এই তো মোটে সেদিন শীতলাদহের বাজারে রামহরির দোকানে মাঝরাতে ঢুকেছিল দু'জন । সতু আগে, পিছনে নসিরাম । ঢুকেই সতুটা হেঁটে ফেলল । রামহরির ছেলে দোকানে শোয় । তার হাতের কাছেই টর্চ আর লাঠি । “কে রে ?” বলে লাফিয়ে উঠতেই ভাঙা জানালা গলে পালাল দু'জন । কিন্তু বাজার বলে কথা । চোখের পলকে চৌকিদার দোকানী আর ব্যাপারী মিলে বেশ পঁচিশ জন জুটে তাড়া করে খালধারে প্রায় ঘরে ফেলল দু'জনকে, তবে ভাগ্য ভালো সবাই অত জোরে ছুটতে পারে না । আর তারাও প্রাণের ভয়ে দৌড়োচ্ছিল । ধরল এসে জনা চারেক । কিল চড় চাপড় গোটা কয়েক পড়ল বটে, কিন্তু দু'জনেই বৃদ্ধি করে শীতের রাতে খালের বরফগলা জলে লাফিয়ে পড়ায় অপের ওপর দিয়ে বেঁচে যায় । কাজেই নফরের দোষ নেই । তারা যে লোক ভাল নয় একথা সবাই জানে । তবে সুবিধেটা এই যে আজকাল লোক কেউই ভাল নয় । এই যে নফর দিবি্য তামাকপাতার পাইকারি কারবার খুলে বসে আছে, আলটপকা দেখলে মনে হয় ভারী সিধে কারবার । কিন্তু তামাকপাতার আড়াল দিয়ে গুলি,

গাঁজা, চরস, ভাঙু আফিং-এর যে ফলাও কারবার চলছে তার খোঁজ রাখে কজন? নসিরাম আর সতু সবই জানে। তাই চলে যেতে বললেও তারা যায় না। নফরও আর বেশী গাঁইগাঁই করেনি।

বেলাটা পড়ে এল, দোকানের পিছনকার ঘাঁটাপড়া জায়গায় আলোটা বিলিতি বেগুনের রঙ ধরল। নসিরামের মনে হল, যথেষ্ট জিরেন হয়েছে।

ও সতু! উঠবি?

সতু আধশোয়া হয়ে ছিল এতক্ষণ। এখন দেখা গেল, ন্যাড়া মাটির ওপর হাতে মাথা পেতে চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। তা ঘুমোবেই। শরীরটা যদুত্তের নেই। ন্যাবার আলিসা আছে। রামতারণের ওই অসুরের মারেও তো কম ধকল যায়নি।

নসিরামের কাছে বিড়ি নেই। থাকলে একটা ধরাত। শরীরটা উসখুস করছে। সতুর কাছেও নেই, সে জানে। বিড়ি নেই, ম্যাচিস নেই, পয়সা নেই। নসিরাম উঠল। কারণ, বসে থাকার কোনো মানে হয় না। যুঁধিষ্ঠির পালের দোকানের পিছনে মস্ত মানকচু গাছটা অনেকক্ষণ ধরে তার চোখ টানছে। মাটির ওপরেই কচুর যে মোথাটা উঠে আছে সেটা দেখে মনে হয়, দশ সেরের কম ওজন হবে না। যুঁধিষ্ঠির কচুগাছের গোড়ায় রোজ এঁটো ভাত, ছাই, গোবর আর কী কী সব ফেলে দিবি পদ্রুগু করে তুলেছে জিনিসটাকে।

শীতের শেষ টান। নসিরাম জানে এই হাটে এখনো মানকচু খুব একটা ওঠেনি। অনায়াসে দু'তিন টাকার বিকিয়ে যাবে। টেনে তুলতেও কষ্ট নেই। জল পড়ে পড়ে জারগাটা এমনিতেই ভুসভুসে হয়ে আছে।

নসিরাম সাবধানে নদ'মাটা পার হয়ে এগিয়ে গেল। চাল থেকে সেই নট নড়ন চড়ন বেড়ালটা হঠাৎ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাকে।

যুঁধিষ্ঠিরের দোকানের পিছন দিকটার দরজাটা আবজানো। কে খোলা রাখবে বাপ! যা দুর্গন্ধ। কচুটা টেনে তোলায় সময় নসিরামের একবার মনে হল, ছিঃ ছিঃ কাজটা ঠিক হচ্ছে না। একটু আগেই বনবিবিতলার মাঠে দার হাতে গুঁপ্তি ছোরা ছিল এখন সেই কিনা কচু—তুচ্ছ কচু চুরি করছে! লোকে দেখলে বলবে কী?

অবশ্য দেখছে না কেউ! কানা লক্ষ্মীকান্ত কয়লা ভেঙে উঠে গেছে। দেখছে শূন্য বেড়ালটা। লালু মিঞার টেলারিং-এর চাল থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে খুব লক্ষ্য করছে তাকে, আর মিঁহন মিয়াও মিয়াও আওরাজ ছাড়ছে। তবে বেড়াল বলে রক্ষে। কুকুর হলে এতক্ষণে ঘাউ ঘাউ করে দুনিয়াকে জানান দিত।

যত সহজে কচুটাকে তোলা যাবে ভেবেছিল নসিরাম, কার্যকালে ততটা সহজ মনে হচ্ছে না। মাটিটা ভুসভুসে পচা মাটি ঠিকই, কচুটাও নড়বড় করছে বটে। কিন্তু গোলমাল অন্য জায়গায়। সেই সকালে দু'গাল পান্তা মেরে বেরিয়েছিল নসিরাম। সেই পান্তা কবে তল হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধরেই পেটটা একেবারে বোমভোলা ফাঁকা। মেহনতও বড় কম যায়নি। এখন মাথাটা

ঝিমঝিম করছে, শরীরটা কাঁহিল লাগছে। ভারী কচুটা খানিক নাড়িয়ে মাটিটা আরো আলগা করে টান দিতে গিয়েই পাঁজরে খিঁচ ধরে দম বন্ধ হয়ে এল। দৃ হাতে বুকটা চেপে ধরে উবু হয়ে বসে পড়ল সে। হাতখানেক বেরিয়ে আসা কচুটা আবার নিজের গর্তে বসে গেল। লালু মিমার চাল থেকে বেড়ালটা পায়ে হেঁটে চলে আসছে যুধিষ্ঠিরের দোকানের চালে। খুব চেল্লা-চেল্লি করতে লেগেছে হঠাৎ! নসিরাম একটা ঢেলা ফুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল। তারপরই বুকুল ভুল হয়েছে। ঢেলাটা বেড়ালের গায়ে লাগল কিনা কে জানে, তবে যুধিষ্ঠিরের টিনের চালে খটাং কবে একটা শব্দ হল।

নসিরাম ফেরত যাবার জন্য উঠতে যাচ্ছিল। কপাল খরাপ। বাঁ পায়ে জোর ঝাঁ ঝাঁ ধরেছে। একেবারে অবশ। উঠতে গিয়েও ফের বসে পড়তে হল। দোকানঘরের পিছনের দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল যুধিষ্ঠির।

এমনিতে দেখলে যুধিষ্ঠিরকে ভয়ের কিছু নেই। রোগা ভোগা চেহারা। কিশ্ত, কপালে তিলক, গায়ে হাফহাতা গেঞ্জি। কিন্তু চেহারা দেখে বিচার করলে খুবই ভুল হবে। যুধিষ্ঠির দেখা দিয়েই মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল, কোন শুরোরের বাচ্চা রে?

আশ্চর্য, নসিরামের রাগ হল না। আজকাল রাগটাগ কম য়াচ্ছে। সে একটু তেজী গলায় বলার চেষ্টা করল, গালমন্দ করছো কেন?

গলায় তেজ তো ফুটলই না, বরং খোনা স্বর বেরোলো। উপোসী পেট থেকে আর কত ষড়্ আওয়াজ বেরোবে?

যুধিষ্ঠির তার সাধের কচুটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে ছিল। মাটি আলগা, কাদায় চোরের পায়ের ছাপ, চোরও বেকায়দায় পড়ে বসে রয়েছে সামনে।

যুধিষ্ঠির কোমরে হাত দিয়ে তেজের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বলল, গালমন্দ করবো না তো কি আমাই আদর করতে হবে নাকি রে ছাঁচড়া হারামজাদা? ওয়ে ও পতু, ইদিকে আয়-

পতুর আসা মানে সাড়ে সর্বনাশ। যুধিষ্ঠির রোগা ভোগা হলেও তার মেজো ছেলে পতিতপাবন রোগা নয়। পাঁটাগোড়া চেহারা। নসিরামের যা অবস্থা এখন ইঁদুরের লাথি খেলেও সহিতে পারবে না। সে তাড়াতাড়ি বলল, তা আমি কী করে জানবো কচুটা তোমার!

আমার নরতো কি তোর বাবার?

নসিরাম উকিল মোস্তারের মতোই বৃদ্ধি খাটিয়ে বলল, জমিটা তো আর তোমার নয়। সরকারবাবুদের হাট, তাদের জমি!

তাই নাকি রে শুরোরের পো? তোর এত আইনের জ্ঞান? ওরে পতু—

ঝাঁঝ ছাড়াতে পায়ে থাবড়া মারতে মারতে উঠে দাঁড়াল নসিরাম। বলল, চেঁচাচ্ছে কেন খামোখা? যেতে বলছ যাচ্ছ।

কখন তোকে যেতে বললাম রে খানিকির ছেলে ? ওরে পতু ! শুনহিস !
শীগগীর আয়—

পতু প্রথমটা শুনতে পারিনি। এবার পেল। বেরিয়ে এসে বলল, কী
হয়েছেটা কী ?

এই দ্যাখ। চোর ন'সে আমার কচু নিয়ে পালাচ্ছিল। ধর হারামজাদাকে।
নসিরামের ঝাঁঝ ছেড়েছে। সে আচমকাই লাফ দিয়ে নর্দমাটা পেরিয়ে
গেল। নফরের দোকানের দিকে জোর কদমে হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল,
এঃ ! ভারী তো কচু। পতু যে রেলের গাল নামায়, তার বেলা ? চোর আমি
একা, না ?

একেবারে বেঁচে যাবে এতটা আশা করেনি নসিরাম। পতুও সমান তেজে
নর্দমাটা পেরিয়ে তেড়ে এল। দৌড়তে দৌড়তেই নসিরাম গুনে গুনে তিনটে
গাঁটা খেল মাথায়। যেন তিনটে ঝুনো নারকেল ডগা থেকে খসে মাথায় এসে
পড়ল। আর কিছু অকথা গালাগাল। তবে দোকানে খন্দেরের ভীড় আছে
বলেই বোধ হয় পতু ঝামেলা আর বাড়াল না। তিনটে রামগাঁটায় মাথায়
তিনটে আলু ফুলিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

ফের চোখ অন্ধকার দেখল নসিরাম। মরা কুলগাছটায় হাতের ভর রেখে
অন্ধকারটা ছাড়িয়ে নিল চোখ থেকে। এক রাজ্যের শর্যো লেগে হাতটা
চলকোতে থাকে। তবু অশ্বেপের উপর দিয়েই গেছে বলতে হবে।

কিন্তু কথাটা সে অনায়াসে বলেনি। যুধিষ্ঠিরের চায়ের দোকান যত ভালই
চলুক, তাদের আসল আয় দোকান থেকে নয়। পতু জংশন স্টেশনে রেল থেকে
মাল খালাস করার দু'নম্বরী ব্যবসায় বহুদিন হল ভিড়ে গেছে। রেলের পদলিখ
নিজেরাই ব্যবসার ফোঁদেছে। পতুরা কম দামে মাল নামিয়ে আনে। বেশী
দামে বেচে দেয়। ধরা পড়ার ভয়টা নেই।

সতু এতক্ষণে উঠে বসেছে। কাণ্ডটা বোধ হয় দেখেছেও। হাই তুলে বলল,
বেশী কথা বলা তোরও দোষ ! তাত কথা বলতে যাস কেন ?

নসিরাম রাগ করে বলে, খামোখা গালমন্দ করছিল দেখলে না ?

খামোখা করে রে পাগল ! তোরও দোষ ছিল। চল রওনা দিই। আজ
আর কিছু হওয়ার নয়। দিনটাই খারাপ।

বয়সে সতু নসিরামের চেয়ে বছর কয়েকের বড়। তার বউ আছে, গোটা
চারেক বাচ্চা আছে। নসিরামের ওসব নেই। দুজনেই ভুঁইঞাদের জমিতে
চাষ করত। বর্গা রেজিস্ট্রার সময় মাতব্বররা তাদের বাদ দিয়ে অন্য দুজনের
নাম বসাল। কিছুতেই টলল না। নতুন বর্গাদার ভুঁইঞাদের নিজস্ব লোক।
মাতব্বরদের টাকা খাইয়ে ওরাই ওই কাজ করে। সেই থেকে সতু কণ্টে আছে।
দুজনেই বৃদ্ধি পরামর্শ করে চৌরী ছাঁচড়ামির লাইন ধরল বটে। কিন্তু আজ
অবধি তেমন সুবিধে হল না।

নসিরাম গোঁ ধরে বসে বলল, তুমি যাও । আমি যাব না ।

তবে কি এখানে বসে বসে মশা তাড়াবি ?

তাই তাড়াবো ।

তোর বড় তেজ । অত তেজ ভাল নয় । আজ আর লোহারগজ গিয়ে কাজ নেই, কালীতলাতেই চল । একটা চট পেতে দাওয়ার পড়ে থাকবি ।

অভিমান ভরে নসিরাম বলে, তোমার বউ তোমার জন্য রেঁধে রেখেছে, আমার জন্য তো আর রাখেনি ।

এ কথায় সতু হাসল, বলল, রেঁধে রেখেছে তো মেলা । উনুনে নিজের হাত পা গর্জে দিয়ে নিজের মৃদুটা সেধ করে রেখেছে । চল, নুন দিয়ে মেখে তাই খাবি । তাও নুন যদি মৃদির পো ধারে দেয় ।

নসিরামের অভিমান যায়নি । বলল, তোমার বউয়ের মৃদু তুমি খাওগে ।

তোর বস্ত্র মেজাজ । ঠাণ্ডা হ'তো বাপু । ঠাণ্ডা মাথায় বসে ভাব । ভাবতে ভাবতে একটা কিছ্র বেরিয়ে পড়বে ।

বিড়ির কী বাবস্থা করা যায় বলো তো ?

নফরাকে বল না ।

নফরা দিতে বসেছে আর কি ।

তবে যা, একটু তামাক পাতা নিয়ে আয় । দুজনে বসে চিবোই ।

কিন্তু নসিরাম নড়ল না । গোঁ ধরে বসে রইল । চারদিক ঝেঁপে অন্ধকার নামছে । চকবেড়ের হাটে আলো জ্বলে উঠছে একে একে । কুঁপি, হাজাক, হ্যারিকেন, কারবাইড । আনমনে দৃশ্যটা দেখছিল নসিরাম । ভারী সুন্দর এই অন্ধকারের সঙ্গে আলোর লড়াই । আরো ভাল লাগত যদি পেটের খোঁদলটা এমন হাঁ হাঁ না করত ।

সতু একটা কোঁক দিয়ে ধীরে ধীরে উঠল । কোমরের গামছাটা খুলে মাথায় জড়াতে জড়াতে বলল, এখন সাঁঝের পর খুব হিম পড়ে ! কালীতলায় যদি না ঘাস তো লোহারগজেই যা, ঘরে গিয়ে আজকের রাতটা জিরো ।

নসিরাম তবু নড়ল না, তার কেমন একটা ভাব এসেছে । রামতারণ তাকে একটা মোটে থাবড়া দিয়েছিল । সতুর ভাগটা ছিল অনেকটাই বেশী । এখন আবার পতুর গাটী তিনটে খাওয়ার পর নসিরাম আর সতু প্রায় সমান সমান । তার চেয়ে বড় কথা, তিনটে গাটী তার মাথার ভিতরটা কেমন গুলিয়ে দিয়েছে । চারদিককার এই হাট বাজার, পচা নদ'মার গন্ধ, রৈ-রৈ শব্দ কিছ্রই যেন তাকে তেমন ছর্ছে না ।

সতু আবার জিজ্ঞেস করল, কী রে যাবি ?

না, তুমি যাও ।

সতু একটা বড় শ্বাস ছেড়ে আবার বসে পড়ল । বলল তোর হয়েছোটা কী বল তো !

নসিরাম হঠাৎ মূখ তুলে বলল, হবে আবার কী ? এতক্ষণে রামতারণের লাস মাঠের ধারে পড়ে থাকার কথা, তার ওপর মাছি ভন ভন করার কথা । আমাদের দুজনের হাতে দুটো অস্ত্র ছিল, তবু তা হল না । লোকটা ভয় পেলে না । কেন বলো তো সতু গোঁসাই ? এক গোছা টাকা টাঁকে নিয়ে সে দিবা ফিরে গিয়ে এতক্ষণে বউয়ের হাতপাখার নিচে বসে বাতাস খাচ্ছে ।

হাতপাখার বাতাস খাওয়ার মতো গরম এখনো পড়েনি, কিন্তু সে কথাটা আর সাহস করে বলতে পারল না সতু । গলাটা উদাস রেখে বলল, প্রথম প্রথম ওরকম হয় । ওকে যে মারতে হয়নি সেটা ভালই হয়েছে । মানুষ মারার অনেক হ্যাপা রে । আমরা তো মারতে চাইনি । টাকাটা চেয়েছিলুম ।

আর উঠে যে ও আমাদের মারল !

তা কী করবি বল । রামতারণ শালা খায়দায় ভাল । বোধ হয় ভন বৈঠকও করে । তোর আমার মতো উপোসী পেট তো আর নয় । আমরাও দু দিন ভরপেট খেয়ে নিলে অত সহজে পারত নাকি ! তার ওপর আমার ন্যাবাটা হয়ে...

রাখো তোমার নাবা । নসিরাম খেঁকিয়ে উঠে বলে, আসলে আমরা মরদই নই ।

কথাটা অনায়াস মনে হয় না সতুর । সে চুপ করে থাকে । অনেকক্ষণ বাদে ভয়ে ভয়ে বলে, চল, হাটে একটু ঘুরে দর-দস্তুর দেখি ।

দেখে কী হবে ?

চল না । জিনিসপত্তর দেখলে মনটা অন্যদিকে থাকবে । দরটাও জেনে রাখা ভাল । আমার মুখে থুথু আসছে । একটু তামাক পাতা মুখে না দিলেই নয় ।

নসিরাম চোখ পাকিয়ে বলল, কচুটা কি যুঁধীশ্বর শালার বাপের ?

সতু উদাস গলায় বলল, তারই বা কী করবি ? জোর যার মূলুক তার ।

এঃ জোর ! আমরা যে আসলে মরদই নই সে কথাটা স্বীকার যাচ্ছে না কেন ? যাঁচ্ছি বাপ, স্বীকার যাঁচ্ছি ।

নসিরাম হঠাৎ একটা বাঁকি মেরে উঠে সতুকে দু হাতে নাড়া দিয়ে বলল, তাহলে চলো মরদের মতো একটা কিছু করি !

ভয় খেয়ে সতু বলে, কী করবি ?

একটা কিছু করি, নইলে কোন লজ্জায় বাড়ি ফিরবো ।

নসিরামের মাথায় যে পতুর তিনটে গাঁটা তাড়ির মতো কাজ করছে তা জানে না সতু ।

তবে তার চোখেমুখে হনো ভাবটা দেখে বুঝল, নসিরাম নিজের বশে নেই । পাগলার বান্দু চড়েছে । সে নসিরামের গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, চল তো আগে বেরোই । তারপর দেখা যাবে ।

দুজনে বেরোবার মধ্যে একটা আশ্রয় তামাক পাতা নফরের চোখের সামনেই তুলে নিল নসিরাম। আশ্রয়টা না নিলেও হত। কুঁড়োকাঁড়া মেলা পড়ে থাকে। তাই দিয়েই চলে যেত। তবু আশ্রয় পাতাটাই একটা থাক থেকে তুলে নিল নসিরাম। নফর কিছু বলতে যাচ্ছিল। হয়তো মা-বাপ তুলে একটা খিঁচুই দিত। কিন্তু নসিরাম তার চোখের দিকে চেয়েছিল। কী জানি কেন, কিছু বলল না নফর।

বাইরে এসে একটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে বলা নেই কওয়া নেই চুনের বাটি থেকে এক খাবলা চুন তুলে নিল নসিরাম। পানের দোকানী বাঁ-বাঁ করে উঠেও শেষ অবধি আর কিছু বলল না।

চুন দিয়ে ডলা খানিকটা তামাক পাতা ঠোঁটের নিচে গুঁজবার পর একটু ধাতস্থ হল দুজন।

নসিরাম খানিক থুথু ফেলে বলল, আমাদের কী নেই বলো তো? কেন আমাদের দিয়ে কাজ হচ্ছে না?

সতু মিইয়ে গিয়ে বলে, আমরা যে লোক ভাল। ভাল লোকদের দেখলেই চেনা যায় কিনা।

তোমার মাথা। ভাল লোককে ধরে তাহলে ঠেঙার?

ভাল লোক বলতে ঠিক ভাল লোক নয় বটে। আসলে আহাম্মক ঠাওয়ার। তাই বলো। আহাম্মক আর ভাল কি এক হল?

অত কথা জানলে তো এতদিনে কালীতলা প্রাইমারিতে মাস্টারি করতুম রে। অত কথা কি জানি?

ভাইএগরা যখন জমিতে নতুন বর্গা লাগালে তখন আমরা যেমন আহাম্মক ছিলাম আজও তেমনি আহাম্মক আছি বলছো?

সতু মাথা নেড়ে বলে, আছিই তো।

তাহলে মরদও নই?

তাও খানিকটা ঠিক। কারো সঙ্গেই আমরা তেমন এঁটে উঠছি না। তবে রোজ একটু একটু করে অভোস করলে দেখিস হয়ে উঠব একদিন।

তোমার বয়স কতো?

সতু অবাক হয়ে বলে, কত আর। তোর চেয়ে পাঁচ সাত বছরের বড় হবো। তোর কত?

তা জানি না। তবে বেশী নয় খুব একটা, কমও নয়। ভাবছি হয়ে উঠতে আর কতদিন লাগবে। ততদিনে বড়ো ধড়ো হয়ে যাবো না তো দুজনে?

সতু খুব হাসে। গামছার লাজে মুখ মুছে বলে, বড়ো হওয়া তো ভাল কথা রে। বড়ো বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হয় তাহলে। গতকাল যা দেখছি, ততদিন বেঁচে থাকাটাই তো দার।

নসিরাম আর একবার থুথু ফেলে বলে, তাই তো। বলছিলাম এসব রয়ে

সয়ে হয় না । এসো মরদের মতো একটা কিছ্ কর ফেলি ।

মেটে আলদর দর জিজ্ঞেস করতে একটু দাঁড়িয়েছিল সতু । দোকানী তেরছা একটু চেয়ে দেখল । জবাব দিল না । মাল চেনে । সতুও আর চাপাচাপি করল না । হাঁটতে হাঁটতে বলল, কী বলছিলে ?

বলিহলাম অত ভয় খাও কেন ? একটা ধুন্ধুয়ার কিছ্ লাগিয়ে দিই এসো । যা হোক, একটা রস্তারস্তি কাণ্ড ।

অত উতলা হোস না । রোস ক'দিন ।

সেটা আর ক'দিন ; ভাল পথ তো আর নেই । খারাপ পথেও ভীড় বাড়ছে । শেষে সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে । তখন ?

কেন, এই তো সেদিন রতন সিং-এর গরুটা চুরি করলুম দুজনে ।

সে আর ক'টা টাকাই বা দিয়েছে ! গো হাটার লোকটা চোরাই গরু বলে ধরে ফেলল । দিল মাত্র একশটা টাকা । ভাগাভাগি হয়ে তোমার পঞ্চাশ, আমার পঞ্চাশ । ও তো পিচেশপনা । বড় কিছ্ না করলে বড় দাঁও মারা যায় না, বুঝলে ।

বুঝছি রে বাপ, হাড়ে হাড়ে বুঝছি । তাই বড় ছটফট করছি স আজ । এমন তো ছিল না ।

আজ রস্টা কিছ্ গরম লাগছে ।

আয় তেলেভাজা খাই । পেটে কিছ্ পড়লেই রস্ট ঠাণ্ডা হবে । আমার কাছে একটা টাকা আছে ।

আছে ? বলোনি তো এতক্ষণ !

বলার ফাঁক দিলি কই ? যা গেল হুজ্জত । পরশু ব্রজবিলাসের বাড়ি থেকে দুটো কাঁসার থালা সরিয়েছিলাম । তারই তলানি একটা টাকা পড়ে আছে ।

তাহলে তেলেভাজা খেতে চাইছো কেন ? অত বাবুগিরি কি আমাদের পোষায় ? বরং একটু কুপ্মি কলাই আর নুদন কিনে বাড়ি যাও । সৈধ্য করে ছেলেপুলে বউ নিয়ে থাকবে ।

বলছি স ?

বলছি । খিদেটা আছে থাক । শরীরটা গরম লাগছে । চনমনে লাগছে । পেটটা ঠাণ্ডা হলে এই ভাবটা মরে যাবে ।

সতু আমতা আমতা করে বলল, তোকে আমার এখন একটু একটু ভয় করছে কেন রে নসু ?

নসিরাম হাঃ হাঃ করে খানিক হাসল । মাথায় এবটু োত বোলাল সে । তিনটে আলু ফুটিয়ে দিয়েছে পতু শালা । কেন ? না একটা কচু নিয়ে বস্তান্ত । দুনিয়াটা যে কী ছোটোলোকই হয়ে গেছে বাপ !

চকবেড়ের সরকারদের এই হাট ভারী রমরমে জায়গা । নামে হাট হলেও

আসলে পাকা এবং স্থায়ী বাজার। হুপ্তায় দু'দিন বাজারের গায়েই হাট বসে। আজ সেই হাটবার। মেলা লোকের আনাগোনা। দু'জনে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বিশেষ লক্ষ্য করছে না তাদের।

সতু বলল, কথাটার জবাব দিলি না ?

কোন কথাটার ?

তোকে দেখে এখন আমার একটু গা হুমহুম করছে কেন ?

ওঃ, কী যে ছাতামাথা বলো না ! আমি কি ভূত যে গা হুমহুম করবে ?

ভূত নোস। তবে তোর হাবভাব ভাল লাগছে নারে নসু। কী যে একটা মতলব আঁটিছিস মনে মনে !

সে তো আঁটিছই। হাবভাব ভাল করার জন্য এ লাইনে নেমেছি নাকি।

তা বটে। তবে মাথাটা ঠান্ডা রাখিস।

রাখা যাচ্ছে না। মাথা ঠান্ডা থাকে কখনো ? তাতে অস্ত্র নিয়ে হামলা করলুম, তাও রামতারণ শালা পু'লিশে দিল না। এমন কি ইসমাইলকে পর্যন্ত পিছদে লাগাল না। তার মানেটা বুঝছো ? তার মানে, রামতারণ আমাদের মনিষ্য বলেই জ্ঞান করেনি। ছিঁচকে চোরকেও লোকে এর বেশী খাতির দেয়। তা জানতে চাইছিলুম, আমাদের কী নেই ! কীসের অভাব আছে। লোকে ভয় খাচ্ছে না। পাত্তা দিচ্ছে না। রামতারণ এমন কিছু ডাকাবুকো লোকও নয়। গেরস্ত মানুষ, পাইক নিয়ে চলে, ঘেয়েমানুষ করে, তার ভয়-ভীতি থাকার কথা। তারপর ধরো, যু'ধিষ্ঠিরের পো পতু চোর বলে তিনটে গাঁট্টা আর গালাগালি দিয়ে ছেড়ে দিল। লোক জড়ো করল না, তেমন চেঁচামেচি করল না। তার মানেও কিন্তু ওই। মানুষ বলেই ধরছে না।

তোর মাথাটাই বিগড়ে গেছে আজ।

তা বলতে পারো। নাও তামাকটা একটু ডলো। আর একটু চড়াই।

খিদে মরেছে ?

মরেছে। আর একবার চড়ালে একদম মরে যাবে।

মাসুদের জুদার দোকানের সামনে একটা আয়না ঝোলানো ম'ম' করছে গন্ধ। খৈনী ডলতে ডলতে আচমকাই সতু আয়নাটার দিকে চেয়ে চমকে গেল। চেক লু'ঙ্গি, শার্ট'সোয়েটার পরা একটা ছিপছিপে লোক পিছদ ফিরে আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বোধহয় মুখের ব্রণ টিপছিল। হাজ্জাকের আলোর পার্শ্বকার দেখা গেল মুখখানা। ইসমাইল। হাতে টর্চ'ছাড়া আপাতত কোনো অস্ত্র দেখা যাচ্ছে না। তবে ওর লু'ঙ্গি বেট দিগে বাঁধা থাকে। সেই বেটে ঝোলে চাকুর খাপ। কিন্তু কথা হল, ইসমাইল তাদের খবর রাখে কিনা।

খৈনী ডলতে ডলতে থেমে গিয়ে সতু বলল, নসু, ইসমাইল।

প্রথমটার নসিরাম বুঝতে পারেনি। হাত বাড়িয়ে খানিকটা খৈনী সতুর

হাত থেকে তুলে নিয়ে ঠোঁটে গাঁজল। তারপর আচমকা সেও ইসমাইলকে দেখতে পেল।

দেখতে হয়তো পেত না। কিন্তু ইসমাইল আয়নার ভিতর দিয়ে নিজের মুখ দেখার ছল করে আসলে হাটের লোকজনকে চোখে চোখে রাখছিল। তাদের দৃষ্জনকে দেখতে পেয়েই ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ। লোকটার হঠাৎ সেই ঘুরে দাঁড়ানোটা চোখে পড়াতেই ইসমাইলকে দেখতে পায় নসিরাম। দেখেই একটা চমক লাগে তার। বৃকে একটা চড়াই পাখি ককিয়ে ওঠে। বিশেষ করে ইসমাইলের ধরনটাও ভাল ঠেকে না তার চোখে। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, চোয়াল শত, জু কোঁচকানো, ফর্সা মুখটা একটু রাজা দেখাচ্ছে।

ইসমাইল তাদের নড়বার সময় দিল না। মাসুদের দোকান থেকে একটা লাফ মেরে রাস্তার মাঝখানে পড়ল।

কি যে শশলা! খুব মস্তান হয়েছিঁস?

রামতারণ তাহলে খবর দিয়েছে? অ্যা! রামতারণ শালা শেষ অবধি খবর দিয়েছে তাহলে?

সত্ব ককিয়ে উঠে বলল, নসু! দৌড়ো! পালা!

নসিরামেরও বৃকের মধ্যে তোলপাড়। তবু সে একটু সত্যিকারের হাসি হেসে বলল, আঃ দাঁড়াও না! রামতারণ শেষ অবধি তো মনিষির মানটা দিয়েছে, নাকি?

কী যে বলিস বিপদের সময়ে! দৌড়ো!

তুমি পালাও।

তুই?

জবাবটা দেওয়ার সময় পায় না সত্ব। ইসমাইল চট করে এসে বাঁ হাতে একটা রুদা মারল সত্বর ঘাড়ে। সত্ব পড়ে গেল।

নসিরাম দেখল, ইসমাইল তার ছুরি বের করেনি। খুব রাগ হল তার। দু দুটো লোককে শব্দ হাতেই মেরে ক্ষান্ত হবে নাকি গুঁড়োটা? সে হাত ছাড়িয়ে ইসমাইলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ঢামনার মতো হাত চালাচ্ছে কেন?

আশ্চর্য! আশ্চর্য! ইসমাইল দ্বিতীয়বার হাত তুলতে গিয়েও একটু থমকে গেল। গনগনে গলায় বলল, কত বড় খুনিয়া হয়েছিঁস রে শালা রেণ্ডর ব্যাটা? জানিস এটা আমার এলাকা!

জানি। কিন্তু আগে অস্ত্র বের করো, তারপর কথা। অত তুচ্ছ-তাচ্ছল্য কিসের হে! বের কর শালা তোর অস্ত্র।

নিজের গলার স্বরে নসিরাম নিজেই অবাক হয়ে গেল। যেন এক বাঘ এসে কখন সে দিয়েছে গলার মধ্যে। খোনা স্বরটা আর পাওয়া যাচ্ছে না তো!

ইসমাইল একটু দ্বিধায় পড়ে গেছে! চারিদিকে লোকজনও জড়ো হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কোমরে জামার তলায় হাত রেখে সে স্থির চেয়ে বলল ফের

এই তল্লাটে পা দিয়েছিঁস তো—

কিন্তু কথাটা শেষ হল না তার। নসিরাম হঠাৎ ক্ষাপা ঘাঁড়ের মতো তেড়ে গেল তার দিকে, রেশ্‌ডির পদ আঁচি না তুই রে? অঁা! কাঁচা খেয়ে নেবো তোকে, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো শালা...

কী যে হল তার হাঁদিশ পাওয়া মদুশকিল। তবে কেমন যেন ভড়কানো মদুখে ইসমাইল পিছদু হটতে লাগল।

আয় শালা! আয় শালা! বলে এগোতে লাগল নসিরাম। হাতে অস্ত্র নেই। পেটে খোঁদল। গালে রামতারণের খাবড়া এখনো চিন চিন করছে। মাথায় পতুর তোলা তিনটে আলদু। তবু শদুধু হাতেই সে হঠাৎ বেড়ালের মতো একটা লাফ মেরে গিয়ে পড়ল ইসমাইলের এক হাতের মধ্যে।

আর পারল না ইসমাইল। বোধহয় জীবনে এই প্রথম সে মদুখ ঘদুরিয়ে ছুট লাগল। এক হাট লোকের চোখের সামনে।

নসিরাম নিজেরে গুঁস্তিত হয়ে গেল ব্যাপারটা দেখে। সে লক্ষ্য করল চারপাশে জড়ো হওয়া শয়ে শয়ে লোক তাকে নীরবে দেখছে। তাদের চোখে ভয়।

*

*

*

একটু বেশী রাত করেই ফিরছিল দদুজন। সতু আর নসিরাম।

সতু বলল, তোর সঙ্গে এই যে রাত বিরেতে রোদু ফিরি, কোনদিন ভয় লাগে না। আজ লাগছে। তোকে আজ ভয় খাচ্ছি কেন রে?

নসিরাম নিজের মাথার তিনটে আলদুতে হাত ধদুনিয়ে বলল, কি জানি কেন, আজ আমার নিজেরই নিজেকে এখন কেমন যেন ভয় ভয় করছে।